(সূরা ফাতিহা)
যার পঠনে মসজিদসমূহ গুঞ্জরিত, কিন্তু....

প্রণয়নে ঃ-
আব্দুল হাকীম বিন আব্দুল্লাহ আল-ক্বা-সিম

অনুবাদে ঃ-
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

'সূরাতুস স্বালাহ' আসলে সূরা ফাতিহার একটি নাম। এ সূরা কুরআনের জননী, কুরআনের প্রধান অংশ, কুরআনের ভূমিকা, কুরআনের সারাংশ।

এতে রয়েছে একমাত্র কেবল আল্লাহর ইবাদত করার কথা এবং কেবল তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার কথা। কিন্তু অধিকাংশ নামাযী তা করে না।

এতে রয়েছে সরল পথে চলার কথা। কিন্তু অধিকাংশ নামাযীই বাঁকা পথে চলে।

এতে রয়েছে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের পথে না চলার কথা। কিন্তু অধিকাংশ নামাযীরাই তাদের পথে চলে।

সোজা সরল পথ, মধ্যমপন্থীদের পথ; অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞার মাঝামাঝি পথ, রাফেযাহ ও নাসেবার মাঝামাঝি পথ, জাবারিয়্যাহ ও ক্বাদারিয়্যার মাঝামাঝি পথ; কিন্তু অধিকাংশ নামাযী মধ্যমপন্থী নয়।

কারণ কি?

রাস্তার ধারে এক সুন্দর দেওয়ালে লেখা আছে, 'এখানে প্রস্রাব করিবেন না করিলে জরিমানা লাগিবে।'

কিন্তু অনেকে এসে সেই লেখার উপরেই পেশাব করছে। ব্যাপারটা কি?

ব্যাপার চারটির মধ্যে একটি হতে পারে ঃ-

(ক) দেওয়ালের গায়ে যা লেখা আছে, পাশে দৃষ্টি-আকর্ষী জিনিস থাকার কারণে তারা তা ধেয়ান দিয়ে দেখে না।

(খ) দেওয়ালের গায়ে যা লেখা আছে, তারা তা পড়তে জানে না বা বুঝে না।
(গ) পড়তে পারে, কিন্তু ভুল পড়ে; তারা পড়ে, 'এখানে প্রস্রাব করিবেন, না করিলে জরিমানা লাগিবে!' সুতরাং তারা জরিমানা দেওয়ার ভয়ে পেশাব করেই যায়!
(ঘ) পড়তে পারে, বুঝে ও জানে; কিন্তু মানে না, গুরুত্ব দেয় না।

নামাযীদের অবস্থাও তাদের মতই হতে পারে। আর এ জন্যই মুহতারাম লেখক আফসোস ক'রে শিরোনামায় লিখেছেন, 'যার পঠনে মসজিদসমূহ গুঞ্জরিত, কিন্তু....।'

কিন্তু তাতে যেন কোন লাভ হয় না, কোন ফল পরিদৃষ্ট হয় না; না আরবী জানা আরবে, আর না আরবী অজানা আজমে!

মুহতারাম লেখক এহেন করুণ অবস্থা লক্ষ্য ক'রে 'সূরাতুস স্বালাহ' রচনা করেন। যদি আল্লাহ এর দ্বারা কোন আরাবীকে উপকৃত করেন। বইটি 'আল-বায়ান' পত্রিকার পক্ষ থেকে ছেপে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। অতঃপর তিনি সরাসরি আমাকে মোবাইল যোগে এটির অনুবাদ করতে বলেন। আমিও সেই আশা রেখে অনুবাদ করি, যদি আল্লাহ এর দ্বারা কোন বাঙ্গালী ভাইকে উপকৃত ক'রে সরল পথে পরিচালিত করেন।

হিদায়াতের মালিক আল্লাহ, হিদায়াত তাঁরই নিকট প্রার্থনীয়। আমরাও সর্বদা সকল কাজে তাঁরই কাছে হিদায়াত চাই। হে আল্লাহ! তোমাকে চিনতে, তোমার ইবাদত করতে, তোমার কথা বলতে, লিখতে ও মানুষের মাঝে প্রচার করতে আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, হিদায়াতের পথে পরিচালিত কর, মধ্যবর্তী পন্থায় আমাদেরকে অবিচলিত রাখ। নিশ্চয় তুমি পরম দয়াবান, করুণাময়।

বিনীত---
অনুবাদক
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী
১০/১০/২০০৯খ্রিঃ
২১/১০/১৪৩০হিঃ

ভূমিকা

الْحَمْدُ للَّه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعينُهُ ، وَنَسْتَغْفرُهُ ، وَنَعُوذُ باللَّه منْ شُرُور أَنْفُسنَا وَسَــيئات أَعمَالنَا، مَنْ يَهْده اللَّهُ فَلا مُضلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْللْ فَلا هَاديَ لَهُ ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَــهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، {يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتــه وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُونَ}، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُم مِّــن نَّفْــسٍ وَاحدَة وَخَلَقَ منْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ منْهُمَا رجَالاً كَثيرًا وَنسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا}، {يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًــا سَديدًا ، يُصْلحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَــدْ فَــازَ فَوْزًا عَظيمًا}.

বক্ষমাণ পুস্তিকাটি সেই অনুধাবন ও চিন্তা-গবেষণারই একটি অংশমাত্র, যার আদেশ মহান আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{كتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاته وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَاب}

অর্থাৎ, আমি এ কল্যাণময় গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ। *(সূরা স্বাদ ২৯ আয়াত)*

অনুধাবন ও চিন্তা-গবেষণার উদ্দেশ্য হল, কথার পশ্চাতে, তার শেষে এবং তাতে শামিল ও তার সম্ভাব্য পরিণতি তথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে একটু থেমে গভীরভাবে ভাবা।

মহান আল্লাহ কুরআন অনুধাবনের ব্যাপারে মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন; তিনি বলেছেন,

{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} (٢٤) سورة محمد

অর্থাৎ, তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? *(সূরা মুহাম্মাদ ২৪ আয়াত)*

মুফাস্‌সির কুরতুবী উক্ত আয়াত তথা অনুরূপ আরো অন্যান্য আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ ক'রে কুরআনের অর্থ জানার জন্য তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ওয়াজেব বলেছেন। *(তফসীর কুরতুবী, সূরা নিসার ৮-২নং আয়াতের তফসীর, ই'রাবুল কুরআন আন্-নাহ্‌হাস ১/৪৭৪)*

পক্ষান্তরে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা বর্জন করার জন্য মহান আল্লাহ কাফেরদের নিন্দা করেছেন; তিনি বলেছেন,

{أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ}

অর্থাৎ, তবে কি তারা এই বাণী অনুধাবন করে না? অথবা তাদের নিকট কি এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি? *(সূরা মু'মিনূন ৬৮ আয়াত)*

সুতরাং প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত মানব-দানব সকলের জন্য জরুরী হল কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-গবেষণা করা, তা অনুধাবন করা এবং এই প্রিয় গ্রন্থের আয়াতসমূহের অর্থ বুঝা, যার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}

অর্থাৎ, সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে মিথ্যা এতে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে না। এ প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৪২ আয়াত)*

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! সুতরাং আমাদের উচিত, আমাদের অন্তরের তালা ভেঙ্গে ফেলা এবং অন্তরের উচিত, আল্লাহর 'রূহ' ও 'নূর' থেকে নিজের খোরাক সংগ্রহ করা। তিনি বলেন,

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا} (٥٢) سورة الشورى

অর্থাৎ, এভাবে আমি নিজ নির্দেশে তোমার প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ)

করেছি রূহ। তুমি তো জানতে না গ্রন্থ কি, ঈমান কি। পক্ষান্তরে আমি একে করেছি এমন আলো, যার দ্বারা আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। *(সূরা শূরা ৫২ আয়াত)*

আল-কুরআন মানুষের জন্য হুজ্জত ও দলীল। এ ব্যাপারেও লোকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মহানবী ﷺ বলেছেন, "কুরআন তোমার সপক্ষে দলীল অথবা বিপক্ষে।" *(মুসলিম ২২৩নং)*

ভাইজান! ধরে নিন, আপনার নিকট একটি রেজিস্ট্রি চিঠি এল, তার উপর কোন আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর লাগানো আছে। তাতে এক মিলিয়ন ডলার, ইউরো অথবা ইএন্ পুরস্কারের কথা ঘোষণা আছে। চিঠির মেয়াদ অনুত্তীর্ণ থাকে। তাতে এমন কিছু বিষয় লিখিত আছে, যা দেখে মনে হয়, সেগুলি উক্ত পুরস্কার লাভের শর্তাবলী।

তখন আপনি ঐ চিঠি নিয়ে কি করবেন বলুন তো?

নিশ্চয় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা যত্ন-সহকারে নিয়ে সত্বর এমন লোকের কাছে যাবে, যে তাকে অনুবাদ ক'রে শোনাবে এবং নিশ্চয় সে এমন অনুবাদকের অনুবাদ ছাড়া সন্তুষ্ট হবে না, যে সবচেয়ে উত্তম ও নির্ভরযোগ্য। পরন্তু সে তাকে সর্বচেষ্টা ব্যয় করার অসিয়ত করবে, যাতে অনুবাদ সঠিক ও সূক্ষ্ম হয়!

নিশ্চয় তার এ আচরণ মন্দ নয়। মানুষ যদি অর্থ উপার্জনে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তার আশায় অপেক্ষা করে, তাহলে তা সঠিক ও হালাল উপায়ে হলে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

কিন্তু পত্র যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং মানুষের পক্ষ থেকে না হয়, সে পত্রে যদি স্বয়ং সুস্পষ্ট সত্য মা'বূদ মহান আল্লাহ বিবৃতি দিয়ে থাকেন, তাহলে তৎপরতা কি হওয়া উচিত? হাসান বলেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কুরআনকে তাঁদের প্রতিপালকের তরফ থেকে আসা পত্র মনে করতেন। ফলে তাঁরা রাতে তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতেন এবং দিনে সেই অনুযায়ী আমল করতেন।' *(ইহয়াউ উলূমিদ দ্বীন ১/৭৫, আল-মুহার্রারুল অজীয*

১/৩৯, আত্-তিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন ৫ অধ্যায়)

মহান আল্লাহ সূরা ক্বামারের চার জায়গায় উপদেশ গ্রহণের জন্য তাঁর কিতাবকে সহজ ক'রে দেওয়ার ওয়াদা দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন,

{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ}

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ ক'রে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? *(সূরা ক্বামার ১৭, ২২, ৩২, ৪০ আয়াত)*

সুতরাং মহিমময় প্রতিপালকের নিকট আমাদের দুআ করা উচিত, যাতে তিনি তাঁর কিতাব দ্বারা উপকৃত ক'রে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন।

اَللّٰهُمَّ إِنَّا عَبِيْدُكَ وَبَنُو عَبِيْدِكَ وَبَنُو إِمَائِكَ، نَاصِيَتُنَا بِيَدِكَ، مَاضٍ فِينَا حُكْمُـــكَ، عَدْلٌ فِينَا قَضَاؤُكَ، نَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِـــيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِّنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْـــدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قُلُوبِنَا، وَنُوْرَ صُدُوْرِنَا وَجَلاَءَ أَحْزَانِنَا وَذَهَابَ هُمُومِنَا.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমরা তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর পুত্র, আমাদের ললাটের কেশগুচ্ছ তোমার হাতে। তোমার বিচার আমাদের জীবনে বহাল। তোমার মীমাংসা আমাদের ভাগ্যলিপিতে ন্যায়সঙ্গত। আমরা তোমার নিকট তোমার প্রত্যেক সেই নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি---যে নাম তুমি নিজে নিয়েছ। অথবা তুমি তোমার গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তা শিখিয়েছ, অথবা তুমি তোমার গায়বী ইলমে নিজের নিকট গোপন রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমাদের হৃদয়ের বসন্ত কর, আমাদের বক্ষের জ্যোতি কর, আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করার এবং আমাদের উদ্বেগ চলে যাওয়ার

কারণ বানিয়ে দাও। *(এটি উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা দূর করার দুআ। দুআটি একবচন শব্দে সুন্নাহতে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ؓ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনা করেছেন ঃ ইমাম আহমাদ মুসনাদ ১/৩৯১, হাদীস নং ৩৭১২, ১/৪৫২, হাদীস নং ৪৩১৮, সহীহ ইবনে হিব্বান ৩/২৫৩, হাদীস নং ৯৭২, মুস্তাদরাকুল হাকেম ১/৬৯০, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১৯৯নং)*

অতঃপর আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত, যাতে আমরা আমাদের প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ প্রতিপালকের বাণী অনুধাবন করতে পারি।

আমাদের প্রত্যেকের ভেবে দেখা উচিত যে, হৃদয়ের মধ্যে কুরআনের বসন্ত কি? তাতে কি ঈমান উদ্‌গত ও প্রতিপালিত হয়ে সেই বৃক্ষের মত হয়েছে, যার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِـــإِذْنِ رَبِّهَا} (٢٥) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, উৎকৃষ্ট বৃক্ষ; যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। যা তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সব সময়ে ফল দান করে। *(সূরা ইব্রাহীম ২৪-২৫ আয়াত)*

অতঃপর কুরআনের সাহচর্যে কি সেই বৃক্ষের বাড়-বৃদ্ধি, দৃঢ়তা, সৌন্দর্য ও ফলদান-ক্ষমতা বর্ধিত হয়েছে?

মালেক বিন দীনার বলেন, 'হে আহলে কুরআন! ঈমান তোমাদের হৃদয়ে কি রোপন করেছে? নিশ্চয় কুরআন মু'মিনের বসন্ত; যেমন বৃষ্টি ভূমির বসন্ত। মহান আল্লাহ আকাশ থেকে ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সে বৃষ্টি পায়খানা করার জায়গাতে পৌঁছে। সেখানে কোন বীজ থাকলে জায়গা নোংরা হলেও তা অঙ্কুরিত ও শস্য-শ্যামল হয়ে সুন্দরভাবে আন্দোলিত হতে কোন বাধা পায় না। সুতরাং হে কুরআনের বাহকেরা! কুরআন তোমাদের হৃদয়ে কি রোপন করেছে? কোথায় একটি সূরার হাফেযরা? কোথায় দু'টি সূরার হাফেযরা? তোমরা তাতে কি আমল করেছ?' *(হিল্য়াতুল আওলিয়া ২/৩৫৮-৩৫৯)*

প্রত্যেকের উচিত, নিজের হৃদয় নিয়ে ভেবে দেখা।

তাতে কি আল-কুরআনের আলো পৌঁছেছে এবং সে তা সাদরে গ্রহণ ক'রে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সে আল্লাহর আলো দ্বারা দর্শন করে? আল্লাহর নিকট প্রিয় জিনিসকে নিজের নিকট প্রিয় মনে করে, অপ্রিয়কে অপ্রিয় মনে করে, শক্তিশালীকে শক্তিশালী এবং দুর্বলকে দুর্বল মনে করে, নশ্বরকে নশ্বর এবং অবিনশ্বরকে অবিনশ্বর মনে করে, সম্মানীকে সম্মানী এবং মানহীনকে মানহীন মনে করে? এইভাবে (সে সবকিছুকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির মানদণ্ডে বিচার ক'রে থাকে)?

হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! এই ইলাহী বার্তা নিয়ে যদি আমরা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা না করি এবং সেই অনুযায়ী কর্ম বর্জন করি, তাহলে আমাদের মহাবিপদ অনিবার্য। আল্লাহর কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া দরুন নানা শাস্তি আমাদের উপর আপতিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى (١٢٦) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى} (١٢٧)

অর্থাৎ, যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে সংকীর্ণতাময় জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? অথচ আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম!' তিনি বলবেন, 'তুমি এইরূপ ছিলে, আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল; কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। সেইভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে। আর এইভাবেই আমি তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালংঘন করেছে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। আর পরকালের শাস্তি অবশ্যই কঠোরতর ও চিরস্থায়ী।' *(সূরা ত্বাহা ১২৪-১২৭ আয়াত)*

কুরআন কারীম প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত মানুষের নিকট মহান আল্লাহর প্রেরিত বার্তা। যে বার্তা তাকে উপদেশ গ্রহণ করতে, শিক্ষা নিতে, চিন্তা-গবেষণা করতে ও আমল করতে আহবান জানায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ} (٥٢) سورة القلم

অর্থাৎ, তা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশই। *(সূরা ক্বালাম ৫২ আয়াত)*

{إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ} (٢٧) سورة التكوير

অর্থাৎ, এ তো শুধু বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র। *(সূরা তাকবীর ২৭ আয়াত)*

{كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (٥٤) فَمَن شَاء ذَكَرَهُ} (٥٥) سورة المدثر

অর্থাৎ, না এটা হবার নয়। নিশ্চয় এ (কুরআন) উপদেশ বাণী। অতএব যার ইচ্ছা সে উপদেশ গ্রহণ করবে। *(সূরা মুদ্দাসসির ৫৪-৫৫ আয়াত)*

{كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَن شَاء ذَكَرَهُ} (١٢) سورة عبس

অর্থাৎ, কক্ষনো (এরূপ করবে) না। এটা তো উপদেশবাণী; যে ইচ্ছা করবে সে তা স্মরণ রাখবে (ও উপদেশ গ্রহণ করবে)। *(সূরা আবাসা ১১-১২ আয়াত)*

ধীরে ধীরে সঠিকভাবে উচ্চারণ ক'রে অর্থ অনুধাবন ক'রে কুরআন পাঠ করা---না বুঝে আবৃত্তি করার মত বেশি বেশি পাঠ করার চেয়ে উত্তম।

আবূ জামরাহ বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, 'আমি খুব দ্রুত গতিতে কুরআন পড়তে পারি। হয়তো বা এক রাতে এক অথবা দুই বার কুরআন খতম ক'রে ফেলি!'

ইবনে আব্বাস বললেন, 'তুমি যা কর, তার মত করার চাইতে একটি সূরা পাঠ করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। তোমাকে যদি করতেই হয়, তাহলে এমনভাবে পাঠ কর, যাতে তোমার কান শুনতে পায় এবং হৃদয় বুঝতে সক্ষম হয়।' *(বাইহাক্বী, সুনান কুবরা ৪৪৯ ১নং)*

কেবল বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তেলাঅত করাই কুরআনকে

অধিকভাবে বুঝার জন্য একমাত্র পথ নয়; কারণ অনেক সময় পাঠকের অনুধাবনের মাধ্যম দুর্বল হতে পারে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সে সক্ষম হবে না।

কুরআন অনুধাবন ও চিন্তা-গবেষণার একটি মাধ্যম হল, পাঠক কুরআনে ব্যবহৃত বিরল শব্দাবলীর অর্থ, আরবের পরিভাষা, ই'রাব (যের-যবর-পেশ-জযম) হওয়ার হেতু, আরবী ভাষার আলঙ্কারিক বর্ণনাভঙ্গি ও ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান। এ ছাড়া হাদীসে নববী, সাহাবাগণ ও তাঁদের পরবর্তী তাবেঈনগণের উক্তি ও তফসীর সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা চাই। তবেই সে তখন কুরআন দ্বারা (রূহের) খোরাক সংগ্রহ করতে পারবে, সমৃদ্ধ হতে পারবে এবং ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারবে। তখন তার উপর সেই প্রতিশ্রুত বর্কত অবতীর্ণ হবে, যার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ}

অর্থাৎ, আমি এ কল্যাণময় গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ। *(সূরা স্বাদ ২৯ আয়াত)*[১]

সুতরাং যা আমার ও আপনার, আমার ভাই ও আপনার ভাই, বরং গোটা মুসলিম সমাজের উচিত এই যে, প্রত্যেকে কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, প্রথমে তার বিরল শব্দার্থ বিষয়ক অভিধান (তফসীর) পাঠ করবে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল শায়খ হাসানাইন মাখলূফের 'তাফসীরু কালিমাতিল কুরআন'। এর থেকে বেশি বড় হল ডক্টর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আল-খুয়াইরীর 'আস-

(১) কুরআন অনুধাবনের বিষয়টি বড় গুরুত্বপূর্ণ। বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। এ বিষয়ে শায়খ সালমান বিন উমার আস্-সুনাইদী প্রণীত 'তাদাব্বুরুল কুরআন' যথেষ্ট উপকারী।

সিরাজ ফী গারীবিল কুরআন'।

অতঃপর সংক্ষিপ্ত এজমালী তফসীর-গ্রন্থ পাঠ করবে। যেমন, 'আত্-তাফসীরুল মুয়াস্সার, যুবদাতুত্ তাফসীর, তাফসীরুস সা'দী ইত্যাদি।

অতঃপর তার চাইতে অধিক বিস্তারিত তফসীর-গ্রন্থ পাঠ করবে। সেই সাথে এই উম্মতের সলফ ও শ্রেষ্ঠ শতাব্দিগুলির উলামার মতামত---বিশেষ ক'রে আক্বীদার বিষয়াবলীতে তাঁদের উক্তি বুঝার চরম আগ্রহ রাখবে।

অতঃপর কুরআন অনুধাবনের পরপর সেই অনুযায়ী আমল করবে। যাতে ভারপ্রাপ্ত মুসলিম তার তিন জগতে---ইহজগতে, মধ্যজগতে (কবরে) ও পরজগতে প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারে।

এ গেল আমভাবে কুরআন অনুধাবন করার কথা। বাকী খাসভাবে সূরা ফাতিহার আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা অন্যান্য আয়াত থেকে অধিক তাকীদপ্রাপ্ত। যে সূরা হল 'আমূদুস স্বালাহ' (নামাযের খুঁটি) এবং 'উম্মুল কুরআন' (কুরআনের মা, প্রধান অংশ, ভূমিকা)। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ নামাযে ও সূরা ফাতিহা পাঠ করার সময় এই চিন্তা রাখত যে, সে তার প্রতিপালকের সাথে সত্য-সত্যই নিরালায় আলাপ করছে (তাহলে কতই না সুন্দর হত)! যেহেতু তাতে রয়েছে বান্দা ও রাব্বুল আলামীনের মাঝে কথোপকথন। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে যে, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি নামায (সূরা ফাতিহা)কে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ ক'রে নিয়েছি; অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' সুতরাং বান্দা যখন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'আর-রাহমা-নির রাহীম।' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল।' আবার বান্দা যখন বলে, 'মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন,

'বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল।' আবার কখনো বলেন, 'বান্দা আমার প্রতি (তার সকল কর্ম) সোপর্দ ক'রে দিল।'[১] বান্দা যখন বলে, 'ইয়্যা-কা না'বুদু অইয়্যা-কা নাস্তাঈন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'ইহদিনাস স্বিরা-ত্বাল মুস্তাকীম। স্বিরা-ত্বাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম অলায্ যা-ল্লীন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এ সব কিছু আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চায়, তাই পাবে।" *(মুসলিম ৩৯৫, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, আবূ আওয়ানাহ, প্রমুখ, মিশকাত ৮২৩নং, বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরা ﷺ)*

সূরা ফাতিহার রয়েছে বিরাট মর্যাদা। বান্দা সর্বদা এ কথার মুখাপেক্ষী যে, আল্লাহ তাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন। সুতরাং সে এই দুআর লক্ষ্যের মুখাপেক্ষী। কেননা এই 'হিদায়াত' বা পরিচালনা ছাড়া কেউ আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারে না এবং সুখ ও সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না। আর যে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকে, সে হয় ক্রোধভাজনদের অন্তর্ভূত, নতুবা পথভ্রষ্টদের। পরন্তু আল্লাহর তওফীক ছাড়া সে হিদায়াত অর্জন মোটেই সম্ভব নয়। *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৩৭)*

সূরা ফাতিহার দুআ একটি মহান প্রার্থনা ও গুরুত্বপূর্ণ যাচনা। প্রার্থনাকারী যদি এই প্রার্থনার কদর জানত, তাহলে তা নিজের অভ্যাসে পরিণত করত এবং নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের মত সর্বদা ঐ প্রার্থনা করত। যেহেতু দুনিয়া ও আখেরাতের এমন কোন দুআ নেই, যা এতে শামিল নেই। তাই এই প্রার্থনা উক্ত মর্যাদাপূর্ণ বলেই আল্লাহ সকল বান্দার উপর

(১) কাউকে সকল কর্ম সোপর্দ করার অর্থ হল, সবকিছুর দায়িত্বভার তাকে প্রদান করা এবং তাতে তাকে ফায়সালাকারী মানা। বলা বাহুল্য, মু'মিন কিয়ামতের দিনের সকল ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে। সুতরাং এখানে মহান আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা ক'রে তাঁর গৌরব বর্ণনা করা হয়।

দিবারাত্রে পুনঃ পুনঃ পাঠ করাকে ফরয করেছেন। অন্য কোন দুআ এর বিকল্প হতে পারে না। আর এখান থেকেই নামাযে সূরা ফাতিহা অবধার্য হওয়ার কথা জানা যায়। আর এ কথাও জানা যায় যে, তার স্থলে এমন কোন (সূরা বা দুআ) নেই, যা তার পরিবর্ত হতে পারে। *(বাদাইউত তাফসীর ১/২২৩)*

মুসলিমরা তাদের নামাযের প্রত্যেক রাকআতে এই মহান দুআ দ্বারা প্রার্থনা ক'রে থাকে। আর সমস্ত মসজিদ ও নামাযের মুসাল্লা তার শেষে 'আমীন' বলার শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাদের অনেকেই তার অর্থ বুঝে না। তাদের কাউকে যদি ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেন যে, 'তুমি কি প্রার্থনা করলে?' তাহলে দেখবেন, সে ইতস্তত করছে এবং কোন উত্তর দিতে পারছে না!

অথচ বিদিত যে, দুআ কবুল না হওয়ার একটি কারণ হল দুআর অর্থ না জানা। যেহেতু তা দুআতে এক শ্রেণীর উদাসীনতা ও অমনোযোগিতা। আর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "তোমরা আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার একীন রেখে দুআ কর। আর জেনে রেখো যে, উদাসীন অমনোযোগী হৃদয় থেকে আল্লাহ দুআ কবুল করেন না।" *(তিরমিযী ৩৪৭৯, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৫১০৯,হাকেম ১/৪৯৩, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৯৪নং, আলবানী সহীহ বলেছেন)*

প্রিয় পাঠক! আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা রেখে কিছু সময় বসে এই পুস্তিকার পঙ্ক্তিগুলি পাঠ করুন। চেষ্টা করুন দ্বিতীয়বার পাঠ করার। কারণ পুনঃপাঠ অধিক প্রশংসনীয়। সম্ভবতঃ তা দুনিয়া ও আখেরাতে আপনাকে উপকৃত করবে।

প্রিয় পাঠক! আপনি যখন এই দুআ পাঠ করবেন, তখন যেন আপনার হৃদয়ও আপনার জিহ্বার সাথে একীভূত হয়। যেহেতু যা জিভে বলা হয় এবং অন্তরে স্থান পায় না, তা নেক আমল হয় না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

{يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ} (١١) سورة الفتح

অর্থাৎ, তারা মুখে তা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। *(সূরা ফাত্‌হ ১১ আয়াত, তাফসীরুল ফাতিহাহ ৩৬পৃঃ)*

জেনে রাখুন যে, যে বিষয়ে দুআ করতে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন, সে বিষয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করতেও আপনি আদিষ্ট। আর তা হল, কেবল আল্লাহর ইবাদত করা ও কেবল তাঁরই নিকট সাহায্য চাওয়া। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ১৪/৮)*

সুতরাং এই দুআয় একত্রিত হবে হৃদয়, জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ।

এই মহান দুআ যাতে আল্লাহর দরবারে কবুল হয়, তারই আশায় আমি এর অর্থাবলী এই পুস্তিকায় সংকলন করেছি। যাতে দুআকারী সেই সকল অর্থ খেয়াল রেখে দুআ করে এবং পরিপূর্ণরূপে ও সর্বসুন্দরভাবে তার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। আর আল্লাহই তওফীকদাতা।

সংকলক

আব্দুল হাকীম বিন আব্দুর রহমান আল-ক্বাসেম

অবতরণিকা

সূরাটির অর্থাবলী বর্ণনার পূর্বে অবতরণিকায় দু'টি বিষয়ে কিছু বলতে চাই। প্রথমতঃ নবী ﷺ-এর উপর সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল এবং দ্বিতীয়তঃ সংক্ষেপে এর কিছু মাহাত্ম্য। এতে সূরাটির মর্যাদা বর্ণনা ও তার অর্থ উপলব্ধি করতে প্রভাব রয়েছে।

প্রথমতঃ সূরা ফাতিহার অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল

সূরা ফাতিহা ঠিক কোন সময়ে অবতীর্ণ হয়, সে নিয়ে উলামাগণের তিনটি মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সূরাটি মক্কী; অর্থাৎ, হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, সূরাটি মাদানী; অর্থাৎ, হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

আর কেউ কেউ বলেন, সূরাটি দু'বার অবতীর্ণ হয়েছে; হিজরতের পূর্বে একবার এবং পরে একবার।

বাহ্যতঃ যা মনে হয়---আর আল্লাহই অধিক জানেন---সূরাটি হিজরতের পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছে। এর প্রমাণ হল মহান আল্লাহর এই বাণী,

{وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} (٨٧) سورة الحجر

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি তোমাকে দিয়েছি পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য সাতটি আয়াত এবং মহা কুরআন। *(সূরা হিজ্‌র ৮৭ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে উদ্দেশ্য যে সূরা ফাতিহা, তা এইভাবে বুঝা যায় যে,

তাকে ‘পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য সাতটি আয়াত’ বলা হয়েছে।[৩]

সূরাটি মক্কী হওয়ার প্রমাণ এই যে, সূরা হিজরের উক্ত আয়াতটি মক্কী। তাছাড়া ক্রিয়া এসেছে অতীত কালের শব্দে ‘আমি তোমাকে দিয়েছি’।

সূরাটি মক্কী হওয়ার আরো একটি প্রমাণ এই যে, নামায ফরয হয়েছে মি’রাজের রাত্রে। আর মি’রাজ হয়েছে হিজরতের পূর্বে। আর সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায ইসলামে বিদিত নয়। *(উলামাগণ বলেন, ‘সূরা ফাতিহা নিঃসন্দেহে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয় যে, তা মাদানী। কিন্তু সে কথা স্পষ্ট ভুল। মাজমূউ ফাতাওয়া ১৭/১৯০-১৯১)*

দ্বিতীয়তঃ সূরাটির কিছু ফযীলত ও মাহাত্ম্য

সূরা ফাতিহার বহু ফযীলত রয়েছে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ফযীলত নিম্নরূপ ঃ-

১। সূরা ফাতিহাবিহীন নামায শুদ্ধ নয়। নামায যেমন ইসলামের খুঁটি, অনুরূপ ফাতিহাও নামাযের খুঁটি।[৪]

২। এটি আল-কুরআনের সবচেয়ে বড় মর্যাদাপূর্ণ সূরা।

আবূ সাঈদ রাফে’ ইবনে মুআল্লা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, “মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বেই তোমাকে কি কুরআনের সবচেয়ে বড় (মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূরা শিখিয়ে দেব না?” এই সাথে তিনি আমার হাত ধরলেন। অতঃপর যখন আমরা বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, তখন আমি নিবেদন করলাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যে আমাকে বললেন, তোমাকে অবশ্যই কুরআনের সবচেয়ে বড়

---

(৩) সকলের ঐকমত্যে সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কোন সূরা নেই, যার আয়াত-সংখ্যা সাতটি। অবশ্য সূরা মাউনের ব্যাপারে মতভেদ আছে; কেউ কেউ বলেছেন, তার আয়াত সাতটি। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ছয়টি। *(রূহুল মাআনী, আলূসী ১/৬৮, কূফী ও বাসরী মুসহাফে সাতটি আয়াতই গণনা করা হয়েছে। দেখুন ঃ আল-বায়ান ফী আদ্দি আইল কুরআন ১/২৯১)*

(৪) নবী ﷺ বলেছেন, “সেই ব্যক্তির নামায হয় না, যে ব্যক্তি তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।” *(বুখারী, মুসলিম)---অনুবাদক*

(মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূরা শিখিয়ে দেব?’ সুতরাং তিনি বললেন, “(তা হচ্ছে) ‘আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন’ (সূরা ফাতেহা)। এটি হচ্ছে ‘সাবউ মাসানী’ (অর্থাৎ, নামাযে বারবার পঠিতব্য সপ্ত আয়াত) এবং মহা কুরআন; যা আমাকে দান করা হয়েছে।” *(বুখারী ৪৪৭৪নং)*

৩। সূরাটির ঝাড়ফুঁকে বড় তাসীর আছে।

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, নবী ﷺ-এর কিছু সাহাবা আরবের কোন এক বসতিতে এলেন। কিন্তু সেখানকার বাসিন্দারা তাঁদেরকে মেহমানরূপে বরণ করল না (এবং কোন খাদ্যও পেশ করল না)। অতঃপর তাঁরা সেখানে থাকা অবস্থায় তাদের সর্দারকে (বিছুতে) দংশন করল। তারা বলল, ‘তোমাদের কাছে কি কোন ওষুধ অথবা ঝাড়ফুঁককারী (ওঝা) আছে?’ তাঁরা বললেন, ‘তোমরা আমাদেরকে মেহমানরূপে বরণ করলে না। সুতরাং আমরাও পারিশ্রমিক ছাড়া (ঝাড়ফুঁক) করব না।’ ফলে তারা এক পাল ছাগল পারিশ্রমিক নির্ধারিত করল। একজন সাহাবী উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়তে লাগলেন এবং থুথু জমা ক’রে (দংশনের জায়গায়) দিতে লাগলেন। সর্দার সুস্থ হয়ে উঠল। তারা ছাগলের পাল হাজির করল। তাঁরা বললেন, ‘আমরা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা না ক’রে গ্রহণ করব না।’ সুতরাং তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি হেসে বললেন, “তোমাকে কিসে জানাল যে, ওটি ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র?! ছাগলগুলি গ্রহণ কর এবং আমার জন্য একটি ভাগ রেখো।” *(বুখারী ৫৭৩৬নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সাহাবী গিয়ে ‘আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন’ পড়তে লাগলেন। ফলে সে যেন বাঁধন থেকে মুক্ত হল এবং সুস্থ হয়ে চলাফিরা করতে লাগল।

এই বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ তাঁদেরকে বললেন, “তোমরা ঠিক করেছ।” *(বুখারী ২২৭৬নং, ঝাড়ফুঁককারী সাহাবী ছিলেন আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ)*

“তোমাকে কিসে জানাল যে, ওটি ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র?!” নবী ﷺ-এর

এই উক্তি সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করার স্বীকৃতি ও শুদ্ধতার ইঙ্গিত বহন করে। সেই সাথে কুরআনের বহু সূরার মধ্য হতে এই সূরাকে সঠিকভাবে বেছে নেওয়ার জন্য তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন।

৪। সূরা ফাতিহা হল নূর, জ্যোতি বা আলো। খাস নবী ﷺ-কে এ সূরা দান করা হয়েছিল। অন্য কোন নবীকে এই শ্রেণীর কোন সূরা দেওয়া হয়নি। এ সূরার সুসংবাদ নিয়ে খাস ফিরিশ্তা অবতরণ করেন। এ সূরাতে প্রার্থিত সকল বিষয় দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নবী ﷺ-কে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিবরীল ﷺ নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময় উপর দিক হতে এক শব্দ শুনলেন। উপর দিকে মাথা তুলে তিনি বললেন, "এ শব্দটি আসমানের এক দরজার শব্দ, যা আজ খোলা হল; যা আজ ছাড়া ইতিপূর্বে কক্ষনো খোলা হয়নি। ঐ দরজা দিয়ে এক ফিরিশ্তা অবতরণ করেন।" অতঃপর তিনি বললেন, "তিনি এমন এক ফিরিশ্তা যিনি (আজ) পৃথিবীর প্রতি অবতরণ করলেন, আজ ছাড়া ইতি পূর্বে কোনদিন তিনি অবতরণ করেননি। অতঃপর তিনি সালাম দিয়ে বললেন, '(হে মুহাম্মাদ!) আপনি দু'টি জ্যোতির সুসংবাদ নিন; যা আপনাকে দান করা হয়েছে এবং যা পূর্বে কোন নবীকেই দান করা হয়নি; (তা হল,) সূরা ফাতিহা ও বাক্বারার শেষ (দুই) আয়াত। যখনই আপনি উভয়কে পাঠ করবেন, তখনই আপনাকে উভয়ের প্রত্যেক বাক্যের (প্রার্থিত বিষয় অথবা সওয়াব) প্রদান করা হবে।" *(মুসলিম ১৮৭৭, নাসাঈ ৯১৩নং)*

উক্ত হাদীসে মহান আল্লাহ তাঁর রসূল ﷺ-কে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারার শেষাংশে যে মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও প্রার্থনা রয়েছে, তা দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। আর এ ওয়াদা তাঁর জন্য এবং তাঁর অনুসারী উম্মতের জন্য। যার যেমন আল্লাহর জন্য ইখলাস থাকবে এবং তাঁর রসূল ﷺ-এর আনুগত্য থাকবে, সে তেমন ঐ প্রতিশ্রুত জিনিস লাভ

করবে।

অন্য এক হাদীসে, উবাই বিন কা'ব হতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "উম্মুল কুরআন (কুরআনের জননী সূরা ফাতিহা)র মত আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ তাওরাতে ও ইঞ্জীলে কোন কিছুই অবতীর্ণ করেননি। এই (সূরাই) হল (নামাযে প্রত্যেক রাকআতে) পঠিতব্য ৭টি আয়াত এবং মহা কুরআন, যা আমাকে দান করা হয়েছে।" *(মুওয়াত্তা, আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, তিরমিযী, মিশকাত ২১৪২ নং)*

৫। সূরা ফাতিহার অনেক নাম আছে। আর অনেক নাম মহত্ত্বের দলীল। প্রত্যেক জিনিস তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে মহৎ হয়ে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ সবচেয়ে মহান বলে তাঁর বহু নাম রয়েছে। অনুরূপ নবী ﷺ-এর বহু নাম আছে। ঠিক একই কারণে কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, বাঘ, তরবারি ইত্যাদিরও বহু নাম আছে।

কুরআন-হাদীসে বর্ণিত সূরা ফাতিহার নাম যেমন, ফাতিহাতুল কিতাব, উম্মুল কুরআন, আস্-সাবউল মাসানী, আল-কুরআনুল আযীম, আস্-স্বালাত ইত্যাদি।

আর তার গুণ বর্ণনায় বলা হয়েছে, নূর, রুক্বয়্যাহ ইত্যাদি। *(দেখুন ঃ আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন, সুয়ূত্বী ১/১৬৭-১৭১, এ গ্রন্থে সূরা ফাতিহার বহু নাম ও গুণাবলী উল্লিখিত হয়েছে।)*

সূরাতুল ফাতিহাহ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

(১) অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।
(২) সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।
(৩) যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু।
(৪) (যিনি) বিচার দিনের মালিক।
(৫) আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।
(৬) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও;
(৭) তাদের পথ---যারা ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী) নয় এবং যারা পথভ্রষ্টও (খ্রিষ্টান) নয়।

আল-বাসমালাহ

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম)

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'কে 'বাসমালাহ' বলা হয়। পরিভাষায় একে النحت 'আন্-নাহ্ত' বলে। আর তা হল, فَعْلَلَ (ফা'লালা)র ওজনে (কোন বাক্যের সংক্ষেপরূপ) অতীতকালের ক্রিয়াপদ গঠন করা। এই শ্রেণীর শব্দ হল ঃ 'সুবহানাল্লাহ' থেকে 'সাবহালা', 'আলহামদু লিল্লাহ' থেকে 'হামদালা', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' থেকে 'হাল্লালা', 'হাইয়া আলাস স্বালাহ' থেকে 'হাইআলা', 'লা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' থেকে 'হাওক্বালা' ইত্যাদি।

۞ 'বাসমালা'র অর্থ

'বা' হরফে জার্র, যা উহ্য কোন ক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত এবং তা বক্তার নিয়তে নির্ধারিত। (আর এখানে তা হল أستعين)। সুতরাং 'বিসমিল্লাহ'র অর্থ হল, 'আস্তাঈনু বিসমিল্লাহ'। (অর্থাৎ, আল্লাহর নামে সাহায্য প্রার্থনা করছি।) মহান আল্লাহ বলেন,

{اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ} (١٢٨) سورة الأعراف

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। *(সূরা আ'রাফ ১২৮ আয়াত)*

সাহায্যপ্রার্থী হল বক্তা নিজে। যে বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে তাও উহ্য, যা নিয়ত দ্বারা নির্ধারিত হবে। আর সাহায্যস্থল হল মহান আল্লাহর সকল সুন্দরতম নামাবলী। যেহেতু 'বাসমালাহ'তে 'ইস্ম' বা নাম শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্বদ্ধ ক'রে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। তাই তাতে আল্লাহর সকল সুন্দরতম নামাবলী শামিল হবে।

'আল্লাহ' শব্দটি 'উলূহিয়্যাত' (উপাস্যত্ব)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে। আর তা হল নেহাতই ভালবাসা, ভক্তি ও বিনয়ের সাথে উপাসনা (ইবাদত) করা। ফিরআউনকে তার সম্প্রদায়ের লোক যে উক্তি করেছিল, তা এরই অন্তর্ভূত।

{وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ} (١٢٧) سورة الأعراف

অর্থাৎ, ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, 'আপনি কি মূসাকে ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করতে সুযোগ দেবেন?' *(সূরা আ'রাফ ১২৭ আয়াত)*

এর এ অর্থে বলা হয়, 'আপনাকে ও আপনার উপাসনাকে বর্জন করতে সুযোগ দেবেন?'

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ} (٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর তিনিই আল্লাহ। *(সূরা আনআম ৩ আয়াত)*

অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর তিনিই উপাস্য।

আর উপাসনা ও ইবাদতের একমাত্র যোগ্য তিনিই, যিনি সর্বপ্রকার

ত্রুটিহীন, সুন্দর ও মহিমময় গুণের অধিকারী।

এ নামটি 'তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ'র অন্তর্ভূত। আর তা হল, বান্দার কর্মে (ইবাদতে) আল্লাহকে এক জানা ও মানা।

বান্দার হৃদয়ের গুপ্ত ইবাদত; যেমন, ভয়, ভালবাসা, বিনয়, ভরসা ইত্যাদি।

বান্দার প্রকাশ্য দৈহিক ইবাদত; যেমন, যবেহ, নামায, যাকাত ইত্যাদি।

এই তওহীদকেই কেন্দ্র ক'রে সমস্ত রসূল ও তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন কুরাইশ নবী ﷺ সম্পর্কে বলেছিল,

{أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} (٥) سورة ص

অর্থাৎ, সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? এ তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।' *(সূরা স্বাদ ৫ আয়াত)*

মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর 'আল্লাহ' নাম হতে পারে না। এটি তাঁর সত্তাগত নাম। এই নাম সামগ্রিক অর্থে, আংশিক অর্থে অথবা অনিবার্য অর্থে তিনভাবেই তাঁর সকল সুন্দরতম নামাবলী ও উচ্চতম গুণাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করে।

সুতরাং এই নাম তাঁর উলূহিয়্যাতের প্রতি নির্দেশ করে, যা তাঁর উলূহিয়্যাতের সকল গুণাবলী সাব্যস্ত করে এবং এর বিপরীত গুণাবলী হতে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করে। আর উলূহিয়্যাতের গুণাবলী হল সেই সকল ত্রুটিহীন গুণাবলী, যা সদৃশ ও উপমা হতে এবং যাবতীয় দোষ ও ত্রুটি হতে পবিত্র ঘোষণা করে। এ জন্যই মহান আল্লাহ তাঁর সকল সুন্দরতম নামাবলীকে এই মহান নাম (আল্লাহ)র সাথে সম্বদ্ধ করেন। যেমন তিনি বলেছেন,

{وَلِلَّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى} (١٨٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। *(সূরা আ'রাফ ১৮০ আয়াত)*

যেমন বলা হয়, আর-রাহমান, আর-রাহীম, আল-কুদ্দূস, আস-সালাম, আল-আযীয, আল-হাকীম আল্লাহর এক একটি নাম। কিন্তু বলা যায় না যে, আল্লাহ আর-রাহমানের একটি নাম বা আল-আযীযের একটি নাম আল্লাহ।

অতএব জানা গেল যে, আল্লাহ নামটি তাঁর সকল সুন্দরতম নামের অর্থ দাবী করে এবং ব্যাপকভাবে সে সকল নামের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর সুন্দরতম নামাবলী বিশদ ও বিস্তারিতভাবে ইলাহিয়াতের গুণাবলীর কথা বর্ণনা করে, যেখান থেকে 'আল্লাহ' নামের উৎপত্তি ঘটেছে।

আল্লাহ নামটি এই অর্থ বহন করে যে, তিনি মা'লূহ, মা'বূদ তথা উপাস্য। সারা সৃষ্টি যাঁকে প্রয়োজনে ও বিপদে ভালবাসা, তা'যীম, বিনয় ও ভীতি-বিহ্বলতার সাথে আহবান করে। আর এ কথা দাবী করে যে, পরিপূর্ণ রবুবিয়্যাত (প্রতিপালকত্ব) ও রহমত তাঁরই। সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব, প্রশংসা ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্যও তিনিই।

তাঁর পরিপূর্ণ কর্তৃত্বও এ কথার দাবী রাখে যে, যাবতীয় ত্রুটিহীন প্রশংসনীয় গুণাবলী তাঁরই। যেহেতু সর্বময় কর্তৃত্ব সেই সত্তার জন্য অসম্ভব, যিনি চিরঞ্জীব নন, সর্বশ্রোতা নন, সর্বদ্রষ্টা নন, সর্বশক্তিমান নন, যিনি কথা বলতে সক্ষম নন, যিনি ইচ্ছামত কর্ম করেন না, যিনি তাঁর কর্মাবলীতে সুকৌশলী নন। *(মাদারিজুস সালিকীন ১/৩২-৩৩)*

۞ আর-রাহমান (অনন্ত করুণাময়)

এটি মহান আল্লাহর অন্যতম নাম। এ নাম ইঙ্গিত করে যে, দয়া ও করুণা তাঁর সত্তাগত একটি গুণ। এই জন্য নামটি তার সম্পৃক্ত (বিশেষ্য) ছাড়াই 'রহমত' বিশেষণ নিয়েই ব্যবহৃত হয়।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (٥) سورة طـه

অর্থাৎ, পরম দয়াময় আরশে সমাসীন। *(সূরা ত্বাহা ৫ আয়াত)*

কুরআন-হাদীসের উক্তিতে কোথাও 'আর-রাহমান' নামটি মু'মিন প্রভৃতির সাথে নির্দিষ্ট ক'রে উল্লেখ হয়নি, যেমন 'আর-রাহীম' নামের ক্ষেত্রে হয়েছে। *(বাদাইউত তাফসীর ১/১৩৭)*

'আর-রাহমান' নাম রাখা কোন সৃষ্টির জন্য বৈধ নয়। এক সময় এক নবুঅতের দাবীদার কাফের বিশেষ ক'রে ঐ নাম নিয়েছিল। ফলে তাকে বলা হত, 'রাহমানুল য়্যামামাহ'। পরিশেষে তার নাম হল, 'মুসাইলিমাহ আল-কায্যাব'।[৫]

যেমন কোন কোন প্রতিষ্ঠান ও স্থানের নাম 'আর-রাহমানিয়্যাহ'। এ নাম বিবেচনাধীন (আপত্তিকর)। কারণ এতে মর্যাদার সম্পর্ক রয়েছে। আর মর্যাদার সম্পর্ক জুড়া মর্যাদার সম্বন্ধ জুড়ার মত দলীল-সাপেক্ষ। অবশ্য যারা এ সম্পর্ক জুড়ে এ নাম রেখেছে, তাদের উদ্দেশ্য 'আর-রাহমান' (আল্লাহ) নয়। বরং তাদের উদ্দেশ্য হল আব্দুর রাহমান নামের সাথে সম্পর্ক জুড়া। আর ব্যাকরণের নিয়ম হল, কোন সম্বন্ধ-পদবিশিষ্ট যৌগিক শব্দের প্রতি সম্পর্ক জুড়তে হলে যে শব্দের প্রতি সম্বদ্ধ করা হয় তার প্রতিই সম্পর্ক জুড়া হয়। (যেমন আব্দুর রাহমান = রাহমানী বা রাহমানিয়্যাহ, আব্দুল আযীয = আযীযী বা আযীযিয়্যাহ।) কিন্তু উত্তম হল এ সব ক্ষেত্রে পুরো নামের সাথে সম্বন্ধ জুড়ে নামকরণ করা। যেমন, মাসজিদু আব্দির রাহমান, হাইয়ু আব্দিল আযীয ইত্যাদি। (অমুক রাহমানী বা জামেআহ রাহমানিয়্যাহ ইত্যাদি নামকরণ ঠিক নয়।)

কথার উদ্দেশ্য হল, উক্ত নাম 'আর-রাহমান' থেকে উদ্ভূত। আর ওয়াজেব হল মহান আল্লাহর নামাবলীতে 'ইলহাদ' ও বক্রতা অবলম্বন করা হতে দূরে থাকা এবং জানার সাথে সাথে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

---

(৫) কেউ কেউ বলেছেন, তার ঐ নাম নেওয়া কুফরীতে অতিরঞ্জনমূলক এবং মুসলিমদের প্রতি বিরুদ্ধাচারিতামূলক ছিল। *(দেখুন আত্-তাহরীর অত্-তানবীর, ইবনে আশূর ১/১৭২)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلِلّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْـــمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (١٨٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা সে সব নামেই তাকে ডাকো। আর যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বক্রপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে বর্জন কর, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে। *(সূরা আ'রাফ ১৮০ আয়াত)*

মুশরিকরা 'আর-রাহমান' নামকে অস্বীকার করেছিল। অথচ মক্কী সূরাগুলিতে এই নাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। অবশ্য (মাদানী) সূরা বাক্বারার এক জায়গাতেও এ নাম উল্লিখিত হয়েছে। পক্ষান্তরে কেবল সূরা মারয়্যামের ১৬ জায়গায় এ নাম উল্লিখিত হয়েছে। সূরা ত্বাহা, আম্বিয়া, ইয়াসীন ও মুল্‌কে ৪ বার, সূরা ফুরক্বানে ৫ বার, সূরা যুখরুফে ৭ বার এবং সূরা নাবা'য় ২ বার।

۞ আর-রাহীম (পরম দয়াময়)

এটি মহান আল্লাহর অন্য একটি নাম। এ নাম ইঙ্গিত করে যে, তিনি তাঁর বান্দার প্রতি দয়া ক'রে থাকেন। দয়াময় তাঁর কর্মগত গুণ। তিনি যখন ইচ্ছা দয়া করেন।

মহান আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া ও রহমত দুই প্রকার ঃ-

১। আম রহমত; যা সারা সৃষ্টির জন্য ব্যাপক। মু'মিন-কাফের, মানুষ-পশু সকলেই তাতে শামিল। বলা বাহুল্য, মহান আল্লাহর রহমত প্রত্যেক জিনিসে ছড়িয়ে আছে। তাঁর সৃষ্টি করা, রুযী দান করা, রুযী নির্ধারণ করা, তা লিখে দেওয়া---এ সবই তাঁর ব্যাপক দয়ারই বহিঃপ্রকাশ।

এর একটি প্রমাণ এই যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু সংখ্যক বন্দী এল। তিনি দেখলেন যে, বন্দীদের মধ্যে একজন মহিলা

(তার শিশুটি হারিয়ে গেলে এবং স্তনে দুধ জমে উঠলে বাচ্চার খোঁজে অস্থির হয়ে) দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দীদের মধ্যে কোন শিশু পেলে তাকে ধরে কোলে নিয়ে (দুধ পান করাতে লাগল। অতঃপর তার নিজের বাচ্চা পেয়ে গেলে তাকে বুকে-পেটে লাগিয়ে) দুধ পান করাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা কি মনে কর এই মহিলা তার সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে?" আমরা বললাম, 'না, আল্লাহর কসম!' তারপর তিনি বললেন, "এই মহিলাটি তার সন্তানের উপর যতটা দয়ালু, আল্লাহ তার বান্দাদের উপর তার চেয়ে অধিক দয়ালু।" *(বুখারী ৫৬৫৩, মুসলিম ৬৯৭৮নং)*

২। খাস রহমত; যা কেবল ঈমানদারদের জন্য খাস। এর দলীল মহান আল্লাহর এই বাণী,

{هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّـــورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} (٤٣) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে; যাতে তিনি অন্ধকার হতে তোমাদেরকে আলোকে আনয়ন করেন। আর তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি পরম দয়ালু। *(সূরা আহযাব ৪৩ আয়াত)*

এই রহমত হল সুউচ্চ ও সবচেয়ে বড় মূল্যবান। যেহেতু এরই দ্বারা ঈমানের আলো পরিপূর্ণ হয় এবং এরই দ্বারা বান্দা বেহেশ্তের মহল লাভ করতে পারবে।

অবশ্য কখনো কখনো কোন সৃষ্টিকেও 'দয়ালু' বলে আখ্যায়ন করা হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَـــرِيصٌ عَلَـــيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (١٢٨) سورة التوبة

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রসূল, যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, বড়ই দয়ালু। *(সূরা তাওবাহ ১২৮ আয়াত)*

তবে শ্রোতার জন্য ওয়াজেব হবে স্রষ্টা ও সৃষ্টির দুই দয়ার মাঝে পার্থক্য খেয়াল করা। যেহেতু সৃষ্টি দুর্বল ও ধ্বংসশীল, তার আছে তার উপযুক্ত দয়া। পক্ষান্তরে স্রষ্টা মহাশক্তিশালী, মহাক্ষমতাবান, চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর---সুবহানাহু তাআলা---তাঁর আছে তাঁর উপযুক্ত দয়া। মহান আল্লাহ বলেন,

{لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।

তারপরেই বলেছেন,

{وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা শূরা ১১ আয়াত)*

নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহর একশটি রহমত আছে, যার মধ্য হতে একটি মাত্র রহমত তিনি মানব-দানব, পশু ও কীটপতঙ্গের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। ঐ এক ভাগের কারণেই (সৃষ্টজীব) একে অপরকে মায়া করে, তার কারণেই একে অন্যকে দয়া করে এবং তার কারণেই হিংস্র জন্তুরা তাদের সন্তানকে মায়া ক'রে থাকে। বাকী নিরানব্বইটি আল্লাহ পরকালের জন্য রেখে দিয়েছেন, যার দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন আপন বান্দাদের উপর রহম করবেন।" *(মুসলিম ৬৯৭৪নং)*

বলা বাহুল্য, সৃষ্টির সকল প্রকার প্রেম-ভালবাসা, দয়া-করুণা, স্নেহ-মায়া-মমতা মহান আল্লাহর মাত্র একটি রহমতের ফল। সুতরাং কত পবিত্র সেই পরম করুণাময় প্রতিপালক! কত বিশাল তার করুণা!

۞ 'বাসমালাহ' কি সূরা ফাতিহার অংশ?

মক্কী ও কূফী মুসহাফ তথা আমরা হাফ্স বিন আসেম আল-কূফীর প্রসিদ্ধ ক্বিরাআত অনুযায়ী লিখিত যে মুসহাফ পড়ি, তাতে 'বাসমালাহ'কে সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত গণ্য করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মাদানী, বাসরী ও শামী এই তিন মুসহাফে 'বাসমালাহ'কে সূরা ফাতিহার আয়াত গণ্য করা হয়নি। *(দেখুন ঃ ইতহাফু ফুযালাইল বাশার, আহমাদ আল-বান্না ১/৩৫৭)*

এ থেকে বুঝা যায় যে, এ গণনার ব্যাপারে সাহাবা ﷺ-গণের মাঝে মতভেদ ছিল। এই জন্যই যে মুসহাফসমূহ উসমান ﷺ মুসলিম দেশসমূহে প্রেরণ করেন, তাতে ঐভাবে লিখা হয়েছে।

'বাসমালাহ' যে সূরা ফাতিহার অংশ নয়, তার সবচেয়ে স্পষ্ট দলীল হল এই কুদসী হাদীস ঃ-

"আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি নামায (সূরা ফাতিহা)কে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি; অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' সুতরাং বান্দা যখন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'আররাহমা-নির রাহীম।' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল।' আবার বান্দা যখন বলে, 'মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল।' আবার কখনো বলেন, 'বান্দা আমার প্রতি (তার সকল কর্ম) সোপর্দ ক'রে দিল।'[৬] বান্দা যখন বলে, 'ইয়্যাকা

(৬) কাউকে সকল কর্ম সোপর্দ করার অর্থ হল, সবকিছুর দায়িত্বভার তাকে প্রদান করা এবং তাতে তাকে ফায়সালাকারী মানা। বলা বাহুল্য, মু'মিন কিয়ামতের দিনেসকল ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে। সুতরাং এখানে মহান আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা ক'রে তাঁর গৌরব বর্ণনা করা হয়।

না'বুদু অইয়্যা-কা নাস্তাঈন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'ইহদিনাস স্বিরা-ত্বাল মুস্তাকীম। স্বিরা-ত্বাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায্ যা-ল্লীন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এ সব কিছু আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চায়, তাই পাবে।" *(মুসলিম ৩৯৫, আবূ দাউদ, তিরমিযী, আবূ আওয়ানাহ প্রমুখ, মিশকাত ৮২৩নং, বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরা ﷺ)*

উক্ত হাদীসে সূরা ফাতিহাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ শুরু হয়েছে 'আলহামদু লিল্লাহ...' দিয়ে এবং শেষ হয়েছে 'ইয়্যাকা না'বুদ' দিয়ে। আর দ্বিতীয় ভাগ শুরু হয়েছে 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন' দিয়ে। এখানে 'বাসমালাহ'র উল্লেখ হয়নি। যদি তা সূরা ফাতিহার অংশ হত, তাহলে অবশ্যই তা দিয়ে শুরু করা হত।[৭]

পরন্তু দু'টি ভাগই সমান সমান। যদি 'বাসমালাহ'কে আয়াত গণ্য করা হয়, তাহলে 'ইয়্যাকা না'বুদ' পর্যন্ত সাড়ে চার আয়াত হয়। আর বাকী অংশে হয় আড়াই আয়াত। সে ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহার ভাগাভাগি আধাআধি হবে না এবং তা হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত ভাগাভাগির অনুকূল নয়।

তাছাড়া 'বাসমালাহ'কে আয়াত গণ্য করলে শেষ আয়াতটি খুবই লম্বা হয়ে যায়। আর তা পরিমাণের দিক থেকে সূরা ফাতিহার অন্যান্য আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না।

যেমন 'বাসমালাহ'কে সূরা ফাতিহার আয়াত গণ্য করলে তার কিছু

(৭) 'আমি নামাযকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি' মানে হল 'সূরা ফাতিহাকে ভাগ ক'রে নিয়েছি। যেহেতু পরবর্তীতে কেবল তারই আয়াতসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত সূরার একটি নাম 'সূরাতুস স্বালাহ।' যেহেতু উক্ত সূরা নামাযের খুঁটি ও মূল বুনিয়াদ। বলা বাহুল্য উক্ত হাদীসে কুদসী থেকেই এ পুস্তিকার নামকরণ করেছি।

শব্দ ও অর্থ পুনরুক্ত হয়। যেমন 'আর-রাহমানির রাহীম'-এ। তাতে কোন গণ্য ব্যবধানও নেই এবং নতুন ফায়দাও নেই। আবার 'বিসমিল্লাহ'র মধ্যে যে সাহায্য প্রার্থনার অর্থ আছে, তাও 'অইয়্যাকা নাস্তাঈন'-এ পুনরুক্ত হয়। অথচ সূরা ফাতিহা উম্মুল কুরআন; কুরআনের ভূমিকা ও সারসংক্ষেপ। তাতে নিরর্থক পুনরুক্তি থাকা অসম্ভব। বরং তাতে প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অর্থই বর্ণিত হবে।

পূর্বোক্ত আলোচনার অর্থ এ নয় যে, 'বাসমালাহ' কোন আয়াতই নয়। বরং তা কুরআনের আয়াত। (যেমন তা সূরা নাম্‌লের একটি আয়াতাংশ।) কিন্তু তা সকল সূরা থেকে পৃথক; সূরাগুলির মাঝে পার্থক্য নির্বাচন করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এটাই হল অধিকাংশ উলামার অভিমত। আর আল্লাহই অধিক জানেন। *(দেখুনঃ মাজমূউ ফাতাওয়া ২২/৩৫১)*

'বাসমালাহ' নিয়ে মতভেদের প্রভাব রয়েছে তা নামাযে পড়ার উপরেও। সুতরাং যাঁরা বলেন, তা সূরা ফাতিহার আয়াত, তাঁদের মতে তা পাঠ করা ওয়াজেব। আর অন্যান্যদের মতে তা পাঠ করা সুন্নত। *(আল-মুগনী, ইবনে কুদামাহ ২/১৫১)*

আমি 'বাসমালাহ' দিয়ে সূরা ফাতিহার তফসীর শুরু করেছি, অথচ তা সঠিকমতে সূরা ফাতিহার আয়াত নয়। যেহেতু তা পাঠ করা নামাযীর জন্য বিধেয়, তা কুরআনের একটি পৃথক আয়াত এবং মুসহাফের শুরুতেও তার প্রথম উল্লেখ হয়েছে।

প্রথম আয়াত

{الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

হাম্‌দের অর্থ এবং হাম্‌দ ও শুক্‌রের মাঝে পার্থক্য

হাম্‌দ বা প্রশংসা হল, ভালবাসার সাথে প্রশংসনীয় সুন্দর গুণাবলী দ্বারা প্রশংসার্হের কথা উল্লেখ বা আলোচনা করা। (গুণকীর্তন করা।) এর বিপরীত হল, নিন্দা করা। আর তা হল, ঘৃণার সাথে নিন্দনীয় দোষ দ্বারা নিন্দার্হের কথা উল্লেখ বা আলোচনা করা।

'আল-হাম্‌দ'-এ যে আলিফ-লাম প্রয়োগ করা হয়েছে, তা 'ইস্তিগরাক' বা সকল প্রকার প্রশংসাকে শামিল করার জন্য।

হাম্‌দ ও শুক্‌রের মাঝে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। যেমন ঃ-

হাম্‌দ হয় সর্বাবস্থায়; দুঃখে ও সুখে। পক্ষান্তরে শুক্‌র হয় কেবল সুখের সময়, নিয়ামত উপস্থিত দেখে।

উভয়ের আদায়ের মাধ্যম নিয়েও কিছু পার্থক্য আছে। যেমন হাম্‌দ হয় কেবল অন্তরে ও জিহ্বায়। পক্ষান্তরে শুক্‌র হয় অন্তরে, জিহ্বায় ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। মহান আল্লাহ বলেন,

{اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا} (١٣) سورة سبأ

অর্থাৎ,'হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ করতে থাক। *(সূরা সাবা' ১৩ আয়াত, তফসীর ইবনে কাসীর ১/২১)*

۞ বান্দার সবচেয়ে বড় সত্য কথা 'আল-হামদু লিল্লাহ'

'লিল্লাহ' শব্দে 'লাম'-এর অর্থ অধিকার। অর্থাৎ, এই ব্যাপক বিশুদ্ধ প্রশংসার অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ। *(তফসীর জামেউল বায়ান, ত্বাবারী ১/৯০)*

সুতরাং সৃষ্টির জন্য প্রত্যেক বিশুদ্ধ প্রশংসা, আল্লাহ তার সবটারই হকদার, তিনিই পরিপূর্ণ সর্বোচ্চ গুণাবলীর সাথে তার যোগ্য অধিকারী। যেহেতু মহান আল্লাহই তা নিয়তির বিধানে বিধিবদ্ধ করেছেন, তার কারণ সৃষ্টি করেছেন এবং তা সহজ ক'রে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

{لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ} (١) سورة التغابن

অর্থাৎ, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। *(সূরা তাগাবুন ১ আয়াত)*

হাদীসে এসেছে,

(اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّه).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমারই নিমিত্তে যাবতীয় প্রশংসা। *(আহমাদ ৩/৪২৪, ৫/৩৯৬, হাকেম ১/৫০৬, ৫০৭, ত্বাবারানীর কাবীর ৫/৪০, বুখারী ঃ আল-আদাবুল মুফরাদ ১/২৪৩, সহীহুল আদাবিল মুফরাদ, আলবানী ৫৪১/৬৯৯নং)*

'আল-হামদু লিল্লাহ' বলার ফযীলতে এসেছে যে, "তা সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ।" *(তিরমিযী ৩৩৮৩, নাসাঈ ১০৬৯, ইবনে মাজাহ ৩৮০০নং, ইবনে হিব্বান ৩/১২৬, হাকেম ১৮৩৪, ১৮৫২নং)*

'আল-হামদু লিল্লাহ' সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ দু'টি কারণে; প্রথমতঃ (এটি ইঙ্গিতবাচক দুআ।) আর মহাদাতার কাছে মহাদান পাওয়ার জন্য ইঙ্গিতবাচক প্রার্থনা যথেষ্ট। উপরন্তু মহান আল্লাহ সবচেয়ে বড় দানশীল ও মহাদাতা।

দ্বিতীয়তঃ 'হাম্‌দ'-এ আছে ভালবাসা ও প্রশংসা। আর ভালবাসা হল সবচেয়ে বড় প্রার্থনা। *(দ্রষ্টব্য ঃ আল-ফাতাওয়া ১৫/১৯, বাদাইউল ফাওয়াইদ ৩/৫২১, আর-রওযাতুন নাদিয়্যাহ, শায়খ যায়দ আল-ফাইয়ায ২৭৮পৃঃ)*

'আল-হামদু লিল্লাহ'র আরো একটি ফযীলত হল, তা 'সুবহানাল্লাহ'-এর সাথে পাঠ করলে "(নেকীর) দাঁড়িপাল্লা ভরে দেয়।" *(মুসলিম ৫৩৪নং)*

এই জন্য 'আল-হামদু লিল্লাহ' বান্দার সবচেয়ে বড় সত্য কথা। যেমন নবী ﷺ রুকূ থেকে মাথা তুলে বলতেন,

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ.

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! তোমারই নিমিত্তে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পূর্ণ এবং এর পরেও যা চাও তা পূর্ণ যাবতীয় প্রশংসা। হে প্রশংসা ও গৌরবের অধিকারী! বান্দার সবচেয়ে বড় সত্য কথা---আর আমরা প্রত্যেকেই তোমার বান্দা। হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদান কর, তা রোধ করার এবং যা রোধ কর, তা প্রদান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না।[৮] *(মুসলিম ৪৭৭নং)*

রুকূর পরে মহান আল্লাহর এই প্রশংসা ও গৌরব বর্ণনা যেন সূরা ফাতিহায় বিবৃত বিষয়েরই পুনরুক্তি। অনুরূপ রুকূ থেকে উঠার সময়ও যা বলতে তাও। যেহেতু রসূল ﷺ-এর নির্দেশমত ইমাম বলবে, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ শুনেছেন, যে তাঁর প্রশংসা করেছে। অর্থাৎ, তার প্রশংসা, স্তুতি ও গৌরব বর্ণনা কবুল করেছেন।

পরিপূর্ণ প্রশংসায় তওহীদও শামিল আছে। যেহেতু প্রশংসাকারী স্বীকার করে যে, মহান আল্লাহই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য। সুতরাং তিনিই সবচেয়ে বেশি ইবাদতের যোগ্য, যেহেতু তিনিই সবচেয়ে বেশি প্রশংসার যোগ্য। যেমন এই প্রশংসা মহান আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ হিকমত ও কৌশল থাকার কথা এবং রসূল প্রেরণ ও কিতাব অবতীর্ণ

---

(৮) বান্দার সবচেয়ে বড় সত্য কথা কোন্‌টি? এ নিয়ে ব্যাখ্যাতাদের দু'টি মত রয়েছে। প্রথম মত হল, 'হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদান কর.....।' আর দ্বিতীয় মত, যা লেখক বলতে চেয়েছেন। অবশ্য প্রথমটাই অধিক সঠিক। *(দেখুন ঃ সুবুলুস সালাম ২/১৩৫)---অনুবাদক*

করাতে পরিপূর্ণ রহমত থাকার কথা দাবী করে। সুতরাং তা 'আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রসূল'-এ সাক্ষ্য দেওয়ার কথাও দাবী করে।

۞ আল্লাহর প্রশংসা সর্বাবস্থায়

যেমন পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, আল্লাহর প্রশংসা হবে সকল অবস্থায়, পক্ষান্তরে কৃতজ্ঞতা হবে বিশেষ অবস্থায়। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ যখন কোন বান্দার সন্তানকে তুলে নেন, তখন ফিরিশ্তাকে বলেন, "হে মালাকুল মাওত! তুমি আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ করেছ? তুমি তার চক্ষু-শীতলকারী বস্তু ও তার অন্তরের ফল কেড়ে নিয়েছ?" ফিরিশ্তা বলেন, 'হ্যাঁ।' তারপর তিনি বলেন, "আমার বান্দা কি বলেছে?" ফিরিশ্তা উত্তরে বলেন, "সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্না লিল্লা-হি অইন্না ইলাইহি রা-জিঊন' পড়েছে।" আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং তার নাম রাখ প্রসংশার ঘর।" *(আহমাদ ৪/৪১৫, তিরমিযী ১০২০নং, ইবনে হিব্বান ৭/২১০, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪০৮নং)*

বলা বাহুল্য, মহান আল্লাহ সর্বাবস্থায় প্রশংসার যোগ্য; এমনকি বিপদ-আপদ, ক্ষতি ও কষ্টের সময়ও।

অনেক লোকে বলে থাকে,

الحمد لله الذي لا يُحمَد على مكروه سواه.

অর্থাৎ, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি ছাড়া অন্য কারো বিপদের সময় প্রশংসা করা হয় না।

এ কথাতে দুইভাবে ভুল-ত্রুটি রয়েছে।

প্রথমতঃ এই শ্রেণীর গুণে কেবল মহান স্রষ্টাই খাস নন। বরং সৃষ্টির মধ্য থেকেও অনেক এমন আছে, যে কষ্ট দেয় অথচ তার প্রশংসা করা হয়। যেমন জ্ঞানী ছেলেকে তার বাপ যখন কোন কষ্টদায়ক অপ্রিয় কথা দ্বারা

শাসন করে, তখন সে তার প্রশংসা করে। অনুরূপ করে প্রত্যেক শিষ্য তার গুরুর সাথে। *(কথাগুলি শায়খ আব্দুর রাহমান বিন নাসের আল-বার্রাক হাফিযাহুল্লাহর)*

দ্বিতীয়তঃ পরিষ্কারভাবে 'মাকরূহ' অপছন্দনীয় বা অপ্রিয় কিছুর সম্পর্ক আল্লাহর সাথে জুড়া আদবের খেলাপ।[৯] সুতরাং এ ক্ষেত্রে বলা উচিত, 'আল-হামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল।' (আল্লাহর প্রশংসা সর্বাবস্থায়।) আর এ কথা সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ যখন কোন পছন্দনীয় জিনিস দেখতেন, তখন বলতেন,

اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

([৯]) মহান আল্লাহর সঙ্গে আদব বজায় রেখে কথা বলতে হয় এবং মন্দের সৃষ্টিকর্তা ও নির্ধারণকর্তা হলেও কোন মন্দের সম্পর্ক তাঁর প্রতি জুড়তে হয় না। বরং তা বলতে হলে ইশারা-ইঙ্গিতে বলতে হয়। যেমন মু'মিন জ্বিনরা বলেছিল,

{وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا} (١٠) سورة الجن

অর্থাৎ, আমরা জানি না যে, জগদ্বাসীর অমঙ্গল অভিপ্রেত, না তাদের প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চান। *(সূরা জ্বিন ১০ আয়াত)*

যেমন ইব্রাহীম عليه السلام বলেছিলেন,

{وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} (٨٠) سورة الشعراء

অর্থাৎ, আমি রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। *(সূরা শুআরা ৮০ আয়াত)*

যেমন খাযির عليه السلام বলেছিলেন,

{أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا} (٧٩) سورة الكهف

অর্থাৎ, নৌকাটির ব্যাপারে (কথা এই যে,) ওটা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে কাজ করত; আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে...। *(সূরা কাহফ ৭৯ আয়াত)*

অথচ তিনি প্রত্যেক কাজের কারণ বর্ণনা ক'রে বলেছিলেন,

{وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا} (٨٢) سورة الكهف

অর্থাৎ,আমি নিজের তরফ থেকে সেসব করিনি। তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলে, এটাই তার ব্যাখ্যা। *(ঐ ৮২ আয়াত)*

অর্থাৎ, সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যাঁর অনুগ্রহেই সৎকর্মাদি পরিপূর্ণ হয়।

আর যখন কোন অপছন্দনীয় জিনিস দেখতেন, তখন বলতেন,

اَلْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

অর্থাৎ, আল্লাহর নিমিত্তে সকল প্রশংসা সর্বাবস্থায়। *(ইবনে মাজাহ ৩৮০৩নং, হাকেম ১৮৪০নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬৫নং)*

'আল্লাহ' শব্দটি নামবাচক, যার মধ্যে উলূহিয়্যাত ও ইবাদতের অর্থ নিহিত রয়েছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহই সত্যিকার মা'বূদ ও উপাস্য; যাঁর ভালবাসা ও তা'যীমের সাথে ইবাদত করা হয়।

এ কথা 'বাসমালাহ'র ব্যাখ্যায় উল্লিখিত হয়েছে; যদিও সে উল্লেখের সঠিক জায়গা এটাই ছিল। কিন্তু 'বাসমালা'য় সে ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছে, যেহেতু তা কুরআনের একটি পৃথক আয়াত এবং সূরা ফাতিহার প্রথমে তা উল্লিখিত হয়েছে অথবা যেহেতু তা বেঠিক মতে সূরা ফাতিহার একটি আয়াত।

যাই হোক, উক্ত বাক্যে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, সকল রকম ও প্রকার প্রশংসার অধিকারী মহান আল্লাহ। এর কারণ স্বরূপ তিনি কতকগুলি গুণাবলী উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নরূপ ঃ-

প্রথম কারণ এই যে, তিনি 'রাব্বুল আলামীন' (নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক)। আর তরবিয়ত ও প্রতিপালন হল ক্রমে ক্রমে কোন জিনিসকে তার পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দেওয়া।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে প্রতিপালকত্বের অর্থ হল, সবকিছুর উপর তাঁর কল্যাণ লাগাতার বহাল রাখা এবং অগণিত নিয়ামত দান করা।

কেউ কেউ বলেন, এখানে প্রতিপালকত্ব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সৃষ্টি, মালিকানা, ইচ্ছামত পরিচালনা ইত্যাদি।

অনেকে প্রথম অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যাতে মালিকানার অর্থ

'মালিকি য়্যাউমিদ্দীন'-এ পুনরুক্ত না হয়। *(আত্-তাহরীর অত্-তানবীর, ১/ ১৬৬)*

সৃষ্টির জন্য মহান আল্লাহর প্রতিপালকত্ব দুই প্রকার ঃ-

১। আম প্রতিপালকত্ব; যাতে সারা সৃষ্টি শামিল। মহান আল্লাহ প্রকাশ্য ও গুপ্তভাবে এই প্রকার প্রতিপালন সকলকে ক'রে থাকেন। তিনি সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন, সকলকে রুযী দান করেন, সম্পদ দান করেন।

২। খাস প্রতিপালকত্ব; যাতে কেবল ঈমানদারগণ শামিল। তিনি তাদেরকে খাসভাবে প্রতিপালন করেন, কল্যাণের তওফীক দান করেন, অকল্যাণ থেকে দূরে রাখেন।

লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, আম্বিয়া ও তাঁদের অনুসারিগণের দুআ শুরু হয় 'রাব্বানা' (হে আমাদের প্রতিপালক!) শব্দ দিয়ে।

আর 'আল-আলামীন' শব্দটি 'আলাম' শব্দের বহুবচন। আর তা হল অস্তিত্বময় বিশ্বের শ্রেণীমালার একটি শ্রেণী, জাত বা জাতি। (বাংলাতে জগৎও বলা হয়।)

আর জাতি বা জগৎও আছে অনেক। যেমন অবিশদভাবে বলা যায়, ফিরিশ্তা-জগৎ, জ্বিন-জগৎ, মনুষ্য-জগৎ, উদ্ভিদ-জগৎ, সমুদ্র-জগৎ ইত্যাদি।

সুতরাং 'আলামূন' (সারা বিশ্ব বা বিশ্বজগৎ) হল মহান আল্লাহ ছাড়া সবকিছু অথবা সারা সৃষ্টি-জগৎ।

ব্যাপকভাবে সারা সৃষ্টি-জগৎ উদ্দিষ্ট হওয়ার একটি দলীল মূসা عليه السلام ও ফিরআউনের কথোপকথন। মহান আল্লাহ বলেন,

{قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٣) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُم مُّوقِنِينَ } (٢٤) سورة الشعراء

অর্থাৎ, ফিরআউন বলল, 'বিশ্বজগতের প্রতিপালক আবার কি?' মূসা বলল, 'তিনি হচ্ছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।'

(সূরা শুআরা ২৩-২৪ আয়াত)

কোন কোন উলামা সৃষ্টিকে 'আলাম' বলার কারণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন যে, যেহেতু ('আলাম' মানে আলামত, চিহ্ন বা নিদর্শন, আর) প্রত্যেক সৃষ্টি সুমহান স্রষ্টার এক একটি নিদর্শন। *(আল-মুহার্রারুল অজীয, ইবনে আত্বিয়্যাহ ১/৬৬, তফসীর কুরতুবী ১/১৩৯)*

আর সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে 'আলামূন' বলার কারণ এই যে, সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে মহান আল্লাহ লালন-পালন করেন। কোন এক সৃষ্টি 'আলাম'-এর বহির্ভূত নয়।[১০]

প্রত্যেক প্রতিপালিত সৃষ্টি নিজ প্রতিপালকের প্রতি দুর্বল, নিতান্ত মুখাপেক্ষী। নিমিষের জন্য তাঁর প্রতি অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর প্রতিপালিত, সুতরাং তিনি ছাড়া প্রশংসার যোগ্য আর কে হতে পারে?

---

(১০) অবশ্য আল-কুরআনে পূর্বাপর বাগ্‌ধারা অনুযায়ী 'আলামীন' শব্দ কিছু সৃষ্টির জন্যও ব্যবহার হয়েছে; যেমন, মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ} (٨٧) سورة ص، سورة التكوير ٢٧

অর্থাৎ, এ (কুরআন) বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। *(সূরা স্বাদ ৮৭, তাকবীর ২৭ আয়াত)*
এখানে উদ্দেশ্য জ্বিন ও ইনসান। কারণ কেবল তারাই কুরআন মানতে আদিষ্ট।
যেমন মহান আল্লাহ বানী ইস্রাঈলের জন্য বলেন,

{يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ} (٤٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বানী ঈস্রাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর, যার দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। *(সূরা বাক্বারাহ ৪৭, ১২২ আয়াত)*
তিনি আরো বলেন,

{وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ}

অর্থাৎ, আমি তো বনী-ইস্রাঈলকে গ্রন্থ, কর্তৃত্ব ও নবুঅত দান করেছিলাম এবং ওদেরকে উত্তম জীবিকা দিয়েছিলাম এবং বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। *(সূরা জাসিয়াহ ১৬ আয়াত)*
এখানে উদ্দেশ্য সেই যুগের মানুষ অথবা উম্মতে মুহাম্মাদীর পূর্ববর্তী যুগের মানুষ।
কখনো 'আলামীন' শব্দ কেবল মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

{أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ} (١٦٥) سورة الشعراء

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষদের সাথেই কুকর্ম কর। *(সূরা শুআরা ১৬৫ আয়াত)*

দ্বিতীয় আয়াত

{الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ}

অর্থাৎ, যিনি অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু।

মহান আল্লাহ এ আয়াতে তাঁর সকল প্রকার প্রশংসার যোগ্যতর অধিকারী হওয়ার দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণ বর্ণনা করেছেন। তাঁর সৃষ্টির প্রতিপালন স্বরূপ নিয়ামত এবং তার প্রতি অনুগ্রহ তাঁর পক্ষ থেকে রহমত, করুণা, দয়া ও কোমলতা রূপে জারী আছে; কঠোরতা, কঠিনতা ও কষ্ট রূপে নয়। শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধানও এরই অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু তাতে কোন কষ্ট ও কঠিনতা নেই। বরং তা সকলের জন্য সহজ-সাধ্য।

ইতিপূর্বে উক্ত দুই মহান নামের ব্যাখ্যা উল্লিখিত হয়েছে। 'আর-রাহমান' মহান আল্লাহর সত্তাগত গুণ বুঝায় এবং 'আর-রাহীম' বুঝায় তাঁর কর্মগত গুণ রহম করাকে।

আল্লাহর রহমত প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত আছে। তিনি বলেছেন,

{وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} (١٥٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। *(সূরা আ'রাফ ১৫৬ আয়াত)*

এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি পরিপূর্ণ শক্তিমান, প্রবল প্রতাপশালী, সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী।

এই সূরাতে বিগত দু'টি গুণ; প্রথম 'বিশ্বজগতের প্রতিপালক' এবং দ্বিতীয় 'অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু' সত্তাগত ও কর্মগত গুণ-বর্ণনার মাধ্যমে বান্দার মনে প্রেরণা ও আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এর পরে 'বিচার দিনের মালিক' গুণ-বর্ণনার মাধ্যমে তার মনে অবাধ্যতা থেকে ত্রাস এবং সীমালংঘন থেকে ভীতি সৃষ্টি করা হয়েছে।

তৃতীয় আয়াত

{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}

অর্থাৎ, বিচার দিনের মালিক।[১১]

মহান আল্লাহ এ আয়াতে তাঁর সকল প্রকার প্রশংসার যোগ্যতর অধিকারী হওয়ার চতুর্থ কারণ বর্ণনা করেছেন। আর তা এই যে, তিনি 'বিচার দিনের মালিক।'

'মালিক'-এর মূল শব্দ 'মুল্‌ক'-এর অর্থ বাঁধা, শাসনায়ত্ত করা। শৃঙ্খলাবদ্ধ করা ইত্যাদি। *(আল-মুহার্রারুল অজীয ১/৬৮)* বলা বাহুল্য, কিয়ামতের দিন একমাত্র আল্লাহর শাসনাধীনে শৃঙ্খলাবদ্ধ দিন; তার শাসন ও শৃঙ্খলায় কোন বিরোধী পক্ষ নেই।

এ আয়াতে 'দীন' মানে হল, ন্যায়পরায়ণতার সাথে বদলা (প্রতিদান বা প্রতিফল)। সুতরাং সেদিন ভারপ্রাপ্ত মানুষকে নিজেদের উপার্জিত ভাল অথবা মন্দ কর্মের বদলা দেওয়া হবে। ইনসাফের সাথে মানুষকে প্রতিদান ও প্রতিফল দেওয়া হবে। অনুগত সৎশীল বান্দাকে নেক বদলা এবং অবাধ্য পাপাচার বান্দাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। অত্যাচারীর নিকট থেকে অত্যাচারিতের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

---

(১১) এই আয়াতে সাবআহ ক্বিরাআতের দুই ক্বিরাআত আছে; আস্বেম ও কাসাঈ পড়েছেন 'মা-লিকি' আর বাকী ক্বারীগণ 'মালিকি' পড়েছেন। *(দ্রষ্টব্য ঃ কিতাবুস সাবআহ, ইবনে মুজাহিদ ১০৪পৃঃ)* অবশ্য উভয়ের অর্থ কাছাকাছি। তবে 'মালিক'কে সত্তাগত গুণ এবং 'মা-লিক'কে কর্মগত গুণে আরোপ করা যায়। *(ফাতহুল ক্বাদীর, শওকানী ১/২২)* আর সে ক্ষেত্রে এ আয়াতের অর্থ সত্তা ও কর্মগত দিক থেকে 'আর-রাহমানির রাহীম'-এর মত হবে।
দুই ক্বিরাআত (মালিক ও মা-লিক)এর অর্থ মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ স্ব-ইচ্ছা অনুযায়ী বিশ্ব-পরিচালনার কথা ইঙ্গিত করে। কিন্তু 'য়্যাউমিদ্দীন'-এর সাথে সম্বন্ধ করার পর কিয়ামতের দিন স্বাধীন পরিচালনার অর্থেও উভয় ক্বিরাআত সমান। *(আত্-তাহরীর অত্-তানবীর ১/১৭৫)*

{يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ} (٢٥) سورة النـــــور

অর্থাৎ, সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন। *(সূরা নূর ২৫ আয়াত)*

তিনি কাফেরদের কথা উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন,

{أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ} (٥٣) سورة الصافات

অর্থাৎ, আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হলেও আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে?' *(সূরা স্বাফ্‌ফাত ৫৩ আয়াত)*

তিনি কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বলেছেন,

{الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ} (١٧) سورة غافر

অর্থাৎ, আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হবে; আজ কারও প্রতি যুলুম করা হবে না। *(সূরা মু'মিন ১৭ আয়াত)*

সৃষ্টির যদি (কেবল মৃত্যুই শেষ হত এবং) পুনরুত্থান, হিসাব ও প্রতিফল না হত, তাহলে তা প্রশংসার অযোগ্য তথা নিন্দনীয় হত। কারণ, তা অনর্থক কাজ। অথচ আল্লাহর কাজ তা নয়; তিনি বলেন,

{أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١١٥) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ} (١١٦) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না? মহিমান্বিত আল্লাহ; যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই; সম্মানিত আরশের অধিপতি তিনি।' *(সূরা মু'মিনূন ১১৫-১১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُـــوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} (٢١) سورة الجاثية

অর্থাৎ, দুষ্কৃতকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে ওদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে? ওদের ফায়সালা কত নিকৃষ্ট! *(সূরা জাসিয়াহ ২১ আয়াত)*

বরং প্রত্যেকটি প্রাণী এমনকি পাখী পর্যন্ত---তাতে তা যত ছোটই হোক না কেন, তাদের আপোসে প্রতিশোধ বিনিময়ের জন্য মহান আল্লাহ প্রত্যেককেই পুনর্জীবিত করবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} (٣٨) سورة الأنعام

অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল প্রত্যেকটি জীব এবং (বায়ুমন্ডলে) নিজ ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রত্যেকটি পাখী তোমাদের মতই এক একটি জাতি। আমি কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি। অতঃপর তাদের সকলকে স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত করা হবে। *(সূরা আনআম ৩৮ আয়াত)*

হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন,

((لَتُؤَدَّنَّ الحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَومَ القِيَامَةِ ، حَتَّى يُقَادَ للشَّاةِ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ القَرْنَاءِ)). رواه مسلم

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারের হক অবশ্যই আদায় করা হবে। এমন কি শিংবিহীন ছাগলকে শিংযুক্ত ছাগলের নিকট থেকে বদলা দেওয়া হবে। *(মুসলিম২৫৮২নং, শায়খ মুহাম্মাদ ফুআদ আব্দুল বাকী বলেছেন, উক্ত প্রতিশোধ বিনিময় শরীয়তের দন্ডবিধি অনুসারে 'ক্বিস্বাস' হিসাবে নয়; বরং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য।)*

সুতরাং মহান আল্লাহ সৃষ্টির জন্য পুনরুত্থান ও প্রতিফলের ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছেন, তার জন্যও তিনি প্রশংসার যোগ্য। যেমন তিনি বলেন,

{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ} (١) سورة سبأ

অর্থাৎ, প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্ত কিছুরই মালিক এবং পরলোকেও সকল প্রশংসা তাঁরই। *(সূরা সাবা' ১ আয়াত)*

{وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (٧٠) سورة القصص

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই, ইহকাল ও পরকালে সকল প্রশংসা তাঁরই এবং বিধান তাঁরই; তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। *(সূরা ক্বাস্বাস ৭০ আয়াত)*

আর শেষ বিচারের দিন সৃষ্টির মাঝে ফায়সালার পর বলা হবে,

{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (٧٥) سورة الزمر

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। *(সূরা যুমার ৭৫ আয়াত)*

এখানে বক্তা অনির্দিষ্ট। সুতরাং তা সকল সৃষ্টির জন্য ব্যাপক। *(দেখুনঃ বাদাইউত তাফসীর ৪/৭৭)*

কিয়ামতের দিন কি ঘটবে, তা মহান আল্লাহ বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন,

{وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٨) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} (١٩) سورة الانفطار

অর্থাৎ, কিসে তোমাকে জানাল, বিচার দিবস কি? আবার বলি, কিসে তোমাকে জানাল, বিচার দিবস কি? সেদিন কেউই কারোর জন্য কিছু করবার সামর্থ্য রাখবে না; আর সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে (একমাত্র) আল্লাহর। *(সূরা ইনফিত্বার ১৭-১৯ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, মহান আল্লাহর যতই নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হন, কেউই কিয়ামতের দিন কোন প্রকার স্বাধীন আচরণের মালিক নন, কোন ক্ষমতা তাঁর হাতে থাকবে না। বরং সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হবে। নবী ﷺ নিজ কন্যাকে বলেছিলেন, "হে মুহাম্মাদের বেটি ফাতিমা! তুমি আমার মাল যত পার চেয়ে নাও। (কাল কিয়ামতে) আল্লাহর নিকট তোমার কোন উপকার করতে পারব না!" *(বুখারী ২৭৫৩নং)*

আয়াতে মহান আল্লাহকে 'দিনের মালিক' বলা হয়েছে। যাতে ঐ দিনে যা ঘটবে তার সমস্ত মালিকানা বুঝা যায়। যেহেতু দিনের মালিক হওয়া বড় কঠিন। আর যে দিনের মালিক হতে পারবে, তার জন্য তাতে সংঘটিত সবকিছুর মালিক হওয়া সহজতর। *(তফসীর বায়যাবীর টীকা, মুহিউদ্দীন শায়খ যাদাহ ১/৩৭)*

আর এ বিশ্বাস এমন এক উদ্বুদ্ধকারী হেতু, যার ফলে বান্দা তার সৃষ্টিকর্তার সাথে সুসম্পর্ক গড়তে পারে এবং বিশুদ্ধভাবে তাঁর ইবাদত করতে পারে। যাতে তিনি তাকে পরিত্রাণ দেন। আর তিনি ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পর্ক রাখে না; চাহে তিনি কোন আল্লাহর বন্ধু হন, যিনি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন; যেমন নবী, ফিরিশ্‌তা, বা নেক লোক। অথবা তা কোন নেক আমল হোক, যা কিয়ামতে সুপারিশ করবে; যেমন আমল-সহকারে কুরআন তেলাঅত এবং রোযা। যেহেতু সুপারিশের মালিক তাঁরা নন। বরং মহান আল্লাহই সুপারিশের মালিক। মহান আল্লাহ বলেন,

{قُل لِّلَّه الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا} (٤٤) سورة الزمر

অর্থাৎ, বল, 'সকল সুপারিশ আল্লাহরই এখতিয়ারাধীন।' *(সূরা যুমার ৪৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى} (٢٦) سورة النجم

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলীতে কত ফিরিশ্তা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না, যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। *(সূরা নাজ্‌ম ২৬ আয়াত)*

একদা আবূ হুরাইরা ﷺ নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভের সর্বাধিক ভাগ্যবান কে?' উত্তরে তিনি বললেন, "কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভের সর্বাধিক ভাগ্যবান হল সেই ব্যক্তি, যে বিশুদ্ধ অন্তরে (বা খাঁটি মনে) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে।" *(বুখারী ৯৯নং)*

পূর্বে আশা ও আগ্রহ সৃষ্টি করার পর পরকালের কথা উল্লেখ ক'রে আল্লাহর তরফ থেকে বান্দাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। যাতে বান্দা আশা ও ভয় উভয়ের মাঝে অবস্থান করে। যাতে সে সাবধান ও সতর্ক হতে পারে এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। যাতে তার খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তি তার পদস্খলন ঘটিয়ে তাকে সেই দিন সম্পর্কে উদাসীন ক'রে না রাখে, যে দিন অবশ্যম্ভাবী। যেদিন প্রত্যেক মানুষকে তার কৃতকর্মের বদলা প্রদান করা হবে।

সূরা ফাতিহার প্রথম তিন আয়াতে ইবাদতের তিন রুক্‌নের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে;

১। ভালবাসা ঃ আর তা রয়েছে 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'-এর ভিতরে।

২। আশা ঃ আর তা রয়েছে 'আর-রাহমানির রাহীম'-এর ভিতরে।

৩। ভীতি ঃ আর তা রয়েছে 'মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন'-এর ভিতরে। *(দেখুন ঃ আল-উবূদিয়্যাহ, শারহুশ শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আর-রাজিহী ১৩৯পৃষ্ঠার টীকা)*

এ আয়াত পড়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, মহান আল্লাহ নিজেকে কেবল 'বিচার দিনের মালিক'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন

কেন? অথচ তিনি তো দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক। যেমন তিনি বলেন,

{أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى (٢٤) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى} (٢٥) سورة النجم

অর্থাৎ, মানুষ যা আশা করে, তাই কি সে পায়? বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই। *(সূরা নাজ্‌ম ২৪-২৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى} (١٣) سورة الليل

অর্থাৎ, ইহকাল ও পরকালের কর্তৃত্ব আমারই। *(সূরা লাইল ১৩ আয়াত)*

এর জবাব কয়েকভাবে দেওয়া যায়; যেমন ঃ-

পূর্বে মহান আল্লাহর ব্যাপক প্রতিপালকত্বের কথা উল্লিখিত হয়েছে, যাতে দুনিয়া ও আখেরাতের মালিকানা শামিল রয়েছে। তিনি 'রাব্বুল আলামীন'; তিনিই বিশ্বজাহানের অধিপতি, তাতে তাঁরই আছে সার্বক্ষণিক স্বাধীন পরিচালন-ক্ষমতা।

দুনিয়ায় একই সময়ে একই সাথে সকল সৃষ্টি একত্রিত হয় না। যেহেতু এক জাতি চলে যায়, অপর জাতি এসে তার ওয়ারেস হয়। (আর কিয়ামতে সকলে একত্রিত হবে।)

দুনিয়ায় সৃষ্টির জমায়েত চিরস্থায়ী নয়। সে জমায়েত ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর। পক্ষান্তরে আখেরাতে রয়েছে অনন্ত সময়। এ জন্য তাকে শেষ-দিবস বলা হয়েছে, যার পর আর কোন দিবস বা দিন নেই।

সেই শেষ দিবসে সকল সৃষ্টিকে একত্রিত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর খাস সার্বভৌমত্ব প্রকাশ লাভ করবে। যেদিন তিনি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলবেন,

{لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ}

অর্থাৎ, আজ কর্তৃত্ব কার? (অতঃপর নিজেই জবাব দেবেন,)

{لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} (١٦) سورة غافر

অর্থাৎ, এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। *(সূরা মু'মিন ১৬ আয়াত)*[১২]

বিগত তিনটি আয়াতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা কিভাবে তাঁর প্রশংসা করব? কিভাবে তাঁর গুণগান করব? কিভাবে তাঁর মহিমা বর্ণনা করব? সুতরাং হাম্‌দ বা প্রশংসা হল, ভালবাসার সাথে প্রশংসনীয় সুন্দর গুণাবলী দ্বারা প্রশংসার্হের কথা উল্লেখ বা আলোচনা করা। 'হাম্‌দ' বারবার করা হলে, তা 'সানা' গুণকীর্তন হয়। আর যদি তার সাথে বড়ত্ব ও মহত্ত্ব উল্লেখ করা হয়, তাহলে গৌরব ও মহিমা বর্ণনা হয়। *(এ ব্যাপারে হাদীসে কুদসী ১০-১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)*

বান্দা যখন নামাযে এই সূরা পাঠ করে, তখন মহান আল্লাহ তার সাথে চুপেচুপে কথা বলেন। সুতরাং বান্দা যখন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'আর-রাহমা-নির রাহীম।' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল।' আবার বান্দা যখন বলে, 'মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল।' অতএব আমরা যখন নামাযে এ সূরা পড়ি, তখন কি আমাদের এই প্রশংসা, গুণকীর্তন ও মহিমা বর্ণনার কথা অনুভব করি? অতঃপর আমরা কি আমাদের পড়ার জবাবে মহান আল্লাহর জবাব খেয়াল ও কল্পনায় আনি?[১৩]

---

(১২) এ অর্থে 'সূর' ফুঁকার লম্বা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। *(দেখুন ঃ ইবনে কাসীর ৪/৭৫)*

(১৩) উক্ত হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মুনাজাতের কথা অনুভব ক'রে বিগত আয়াতগুলির প্রত্যেকটির শেষে থামাকে উলামাগণ উত্তম বলেছেন। (দেখুন ঃ বাদাইউত তাফসীর ১/১১১-১১২) অবশ্য প্রত্যেক আয়াত শেষে থামার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ প্রত্যেক আয়াতকে কেটে কেটে পাঠ করতেন; তিনি 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'-লামীন' বলে থামতেন। তারপর 'আর-রাহমানির রাহীম'

চতুর্থ আয়াত

[إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ]

অর্থাৎ, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।[১৪]

মহান আল্লাহর সুন্দরতম গুণ উল্লেখ ক'রে প্রশংসা করার পর তাঁরই শিখানো মত বান্দা এমন এক সুন্দরতম জিনিসের কথা উল্লেখ করে, যা উক্ত গুণাবলীতে গুণান্বিত প্রতিপালকের জন্য নিবেদন করা কর্তব্য। যে গুণাবলীতে তাঁর কোন সদৃশ ও সমকক্ষ নেই। সুতরাং বান্দা তাঁর বন্দেগী ও ইবাদতের কথা এবং তাতে তাঁর সাহায্য ভিক্ষার কথা উল্লেখ করে। আর এ হল প্রশংসার্হ আল্লাহর সুন্দরতম নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর অসীলা গ্রহণ করার পর তাঁর দাসত্ব ও একত্ববাদের অসীলা গ্রহণ। এই দুই অসীলায় দুআ করলে প্রায়শঃ তা রদ করা হয় না। *(বাদাইউত তাফসীর ১/২০৬-২০৯)*

এই আয়াতটির দু'টি অংশ রয়েছে। প্রথম "আমরা কেবল তোমারই

বলে থামতেন। *(আবূ দাঊদ ৪০০১, তিরমিযী ২৯২৩, হাকেম ২৯০৯, বাইহাক্বী ২২১২, দারাক্বুত্বনী ১১৫৭, ১১৭৫নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুন ঃ সহীহুল জামে' ৫০০০নং)* তাছাড়া মহান আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন 'তারতীল' সহকারে পড়তে আদেশ করেছেন। অর্থাৎ, ধীরে ধীরে থেমে থেমে স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে পড়তে বলা হয়েছে। সুতরাং এ কথাও হাদীসের অর্থকে জোরদার করে এবং প্রত্যেক আয়াত শেষে থেমে যাওয়ার কথাকে তাকীদপ্রাপ্ত করে। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

([১৪]) এ আয়াতে মহান আল্লাহকে সম্বোধন করা হয়েছে। অথচ পূর্বে সূরা শুরুতে তাঁকে 'গায়েব' রাখা হয়েছিল। এরূপ বাক্-রীতিকে 'ইলতিফাত' বলা হয়। এর উপকারিতা হল, ভাষায় সাহিত্য-সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য ভঙ্গিমার বিভিন্নতা। বান্দা যখন আল্লাহর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও মহিমা বর্ণনা করল, তখন মহান আল্লাহ তাকে কাছে ও নিকটে ক'রে নিলেন। আর তখনই বান্দা 'গায়েব'কে সামনে পেয়ে সম্বোধন শুরু করল। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

ইবাদত করি" এবং দ্বিতীয় "আমরা কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই।" প্রথমটি হল গুণকীর্তন এবং দ্বিতীয়টি হল দুআ। যেমন হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেছেন, "বান্দা যখন বলে, 'ইয়্যাকা না'বুদু অইয়্যাকা নাস্তাঈন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।" *(হাদীসটি ১০-১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

۞ ইবাদতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

আরবদের নিকট ইবাদতের আসল অর্থ হল ঃ লাঞ্ছনা। তাঁরা বলেন, 'ত্বারীকুন মুআব্বাদ' অর্থাৎ, পদদলিত রাস্তা। চালু পথ, যার উপর থেকে চলার পথে বাধা সৃষ্টিকারী সকল জিনিস দূর করা হয়েছে।

পথ নির্মাণ করারও বিভিন্ন পর্যায় আছে। পথ যত সুগম ও চালু হবে, পথিকের সে পথে চলার আগ্রহ তত বৃদ্ধি পাবে। অনুরূপ বান্দাও আল্লাহর নিকট; বান্দা যত আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করবে, যত বিধিবদ্ধ ইবাদত করবে, তত তার প্রতি আল্লাহর ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং সেই অনুযায়ী তাঁর নিকট তার মর্যাদাও বৃদ্ধি লাভ করবে।

শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদতের অর্থ হল, প্রত্যক সেই প্রকাশ্য ও গুপ্ত কথা ও কাজ, যা মহান আল্লাহ পছন্দ করেন ও যাতে সন্তুষ্ট হন। *(আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/১৫৫)*

ইবাদতের উক্ত সংজ্ঞাটি ব্যাপক। এতে হৃদয়ের গুপ্ত আমলও শামিল হয়ে যায়। যেমন, ভালবাসা, ঘৃণা করা, ভরসা করা, ভয় করা, আশা করা ইত্যাদি। আর এগুলি যথারীতি করতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন।

নিষেধ করেছেন এমন হার্দিক কর্ম যেমন, অহংকার করা, রিয়া (লোকপ্রদর্শনের জন্য কাজ) করা, গর্ব বা ফখর করা, হিংসা করা, উদাসীন হওয়া, মুনাফিক্বী (কপটতা) করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, আল্লাহর চক্রান্ত থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবা,

মুসলিমদের বিপদ ও কষ্ট দেখে বা শুনে আনন্দিত হওয়া বা হাসা, মুসলিমদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার পছন্দ করা ইত্যাদি।[১৫]

ইবাদতের ব্যাপক অর্থে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কৃত আমল নিম্নরূপ ঃ-

নির্দেশিত জিহ্বার আমল ঃ যেমন, কলেমা পড়া, কুরআন তেলাঅত করা, নামাযে যিক্র পড়া, সালামের জওয়াব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দান করা, সত্য কথা বলা। নিষিদ্ধ কথা বর্জন করা; যেমন আল্লাহ সম্বন্ধে বিনা ইলমে কথা বলা, শির্কী ও বিদআতী কথা বলা, অপবাদ দেওয়া, গালি দেওয়া, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষি দেওয়া, বাজে কথা বলা ইত্যাদি বর্জন করা।

জিহ্বার আস্বাদন দ্বারা বিধেয় ইবাদত ঃ যেমন জীবন ধারণের জন্য যা খেতে বাধ্য তা ভক্ষণ করা, যে ওষুধ না খেলে জীবন যাওয়ার আশঙ্কা কাছে তা খাওয়া, ইবাদতে সাহায্য করবে এমন বৈধ খাবার খাওয়া,

(১৫) 'মাদারিজুস সালিকীন' গ্রন্থে হার্দিক ইবাদতের বিভিন্ন পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে কিছু নিম্নরূপ ঃ আল্লাহকে অবলম্বন করা, আল্লাহর দিকে পলায়ন করা, হৃদয়কে সত্যবাদিতা ও ইখলাসের উপর অভ্যস্ত করা, আনুগত্য করা, ভয় করা, ভালবাসা, ভক্তি করা, তা'যীম করা, আশা করা, বিনম্র হওয়া, বিষয়-বিতৃষ্ণা, সংযমশীলতা, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহতে মগ্ন হওয়া, আগ্রহ ও ভক্তি রাখা, আমল দ্বারা ইল্‌মের এবং ইখলাস ও ইহসান দ্বারা আমলের হিফাযত করা, সর্বদা এই অনুভব রাখা যে, আল্লাহ আমার প্রকাশ্য ও গুপ্ত সবকিছু দেখছেন, আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুর সম্মান করা, আন্তরিকতা ও একাগ্রতা, অবিচলতা, ভরসা, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, আত্মসমর্পণ, ধৈর্যশীলতা, আল্লাহতে সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, লজ্জাশীলতা, সত্যনিষ্ঠা, পরার্থপরতা, সচ্চরিত্রতা, বিনয়ী হওয়া, ভদ্রতা, পরোপকারিতা, দৃঢ় সংকল্প, ইচ্ছা ও তলব, আদব করা, একীন করা, আল্লাহকে নিয়ে একাকীত্ব দূর করা, যিক্‌র করা, আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়া, আল্লাহ ছাড়া অন্যের অমুখাপেক্ষী হওয়া, এমনভাবে ইবাদত করা, যাতে মনে হয় যে, যেন সে আল্লাহকে দেখছে অথবা আল্লাহ তাকে দেখছেন। জ্ঞানবত্তা, হিকমত অবলম্বন, দূরদর্শিতা, প্রশান্তি অনুভব করা, উদ্বেগশূন্য হওয়া, হিম্মত করা, ঈর্ষা করা, (আত্মমর্যাদাবোধ), (ঈমানের মিষ্টতা) প্রাপ্তি, হৃদয় পরিষ্কার রাখা, (খোলা মন হওয়া), খুশী হওয়া, গোপনীয়তা রক্ষা, ঈমানে সুদৃঢ়তা অবলম্বন, রহস্য-উদ্‌ঘাটন, তন্ময়তা, আল্লাহকে দর্শন করার অনুভূতি, হৃদয়কে সঞ্জীবিত রাখা, আল্লাহর সম্যক পরিচয় লাভ, একত্ববাদ।

মেহমানের সাথে খাওয়া, দাওয়াতের খাবার খাওয়া। নিষিদ্ধ আস্বাদন বর্জন করা, যেমন মদ ও বিষ খাওয়া, ওয়াজেব রোযা রাখা অবস্থায় পানাহার করা, সন্দিহান জিনিস ভক্ষণ করা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া ইত্যাদি বর্জন করা।

নির্দেশিত কানের আমল ঃ যেমন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে শরীয়ত ও ঈমানের কথা শোনা ওয়াজেব করেছেন---তা শোনা, নামাযে ইমামের জেহরী ক্বিরাআত মনোযোগ সহকারে শোনা, জুমআর খুতবা মনোযোগ সহকারে শোনা, কুফরী ও বিদআতী কথা শোনা, অবশ্য খণ্ডন ইত্যাদির মত কোন তুলনামূলক মঙ্গল থাকলে অথবা ঐ কথার বক্তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন হলে শোনা যায়। গান-বাজনা শোনা বর্জন করা, যে কথা আপনাকে লুকানো হচ্ছে, সে গোপন কথা কান পেতে শোনা বর্জন করা, অবশ্য যদি সে কথা কোন মুসলিমের জন্য কষ্টদায়ক বা অন্য ক্ষতিকর না হলে ভিন্ন কথা। অনুরূপ মনে ফিতনা সৃষ্টিকারী মহিলার গলার আওয়াজ শোনা বর্জন করা, অবশ্য ফতোয়া জিজ্ঞাসা, বিচার-ফায়সালা বা সাক্ষির ক্ষেত্রে বিধান আলাদা।

চোখের আমল ঃ যেমন, কুরআন দেখে পড়া, অনুরূপ দ্বীনী বই-পুস্তক পড়া, খাদ্য ও উপভোগ্য জিনিসের হালাল-হারাম তমীয করার জন্য দেখা, আমানত জমাকারীদের আমানত তমীয করার জন্য দেখা, বিশ্বজগতে মহান আল্লাহর নিদর্শন দেখা। নিষিদ্ধ জিনিস দেখা বর্জন করা, যেমন কোন অবৈধ নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত বর্জন করা। অবশ্য প্রয়োজনে যেমন বিবাহের প্রস্তাব দিলে, সাক্ষ্যদান কালে বিচারকের চেহারা দেখার প্রয়োজন হলে, চিকিৎসার জন্য দেখার প্রয়োজন হলে ইত্যাদি। তদনুরূপ কাপড়ের নিচে অপরের লজ্জাস্থান দেখা এবং দরজার ভিতরে দৃষ্টিপাত করা বর্জন করা।

নাকের আমল ঃ বিধেয় ঘ্রাণ গ্রহণ করা, যেমন হারাম-হালাল জানার জন্য কোন জিনিসের ঘ্রাণ গ্রহণ করা, ইবাদতে সহযোগিতা করে,

ইন্দ্রিয় সতেজ করে, ইল্‌ম ও আমলের জন্য মনকে চাঙ্গা করে এমন সুগন্ধির সুঘ্রাণ গ্রহণ করা। আতরের হাদিয়া রদ না করাও সুন্নত। আর নিষিদ্ধ ঘ্রাণ গ্রহণ যেমন, ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধির ঘ্রাণ গ্রহণ করা, ছিনিয়ে নেওয়া বা চুরি করা সেন্ট্ শোঁকা, পরনারীর সুগন্ধ গ্রহণ করা, যেহেতু এতে রয়েছে বড় ফিতনা।

হাতের আমল ঃ বিধেয় স্পর্শ যেমন, চারিত্রিক পবিত্রতা বজায় রাখার নিয়তে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে স্পর্শ করা। আর নিষিদ্ধ স্পর্শ যেমন, পরনারী স্পর্শ করা, অনুরূপ ইহরাম ও ই'তিকাফ অবস্থায়, অনুরূপ ফরয রোযা অবস্থায় স্ত্রী-স্পর্শ করা মকরূহ; যদি রোযা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। জাং স্পর্শ করা; যদি তা শরমগাহের শামিল হয়।

হাত-পায়ের আমল ঃ বিধেয় কাজ যেমন, নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য বা ঋণ পরিশোধের জন্য উপার্জন করা, হজ্জ আদায় করা, তওয়াফ করা, তওয়াফে পাথর স্পর্শ করা, সাঈ করা, জামারাতে পাথর মারা, বিপন্নকে সাহায্য করা, উযূ ও তায়াম্মুম করা, উপকারী ইল্‌ম ও পরহিতকর পত্র লেখা, জুমআহ ও জামাআতের নামায পড়তে যাওয়া, আল্লাহ বা তাঁর রসূলের কোন আদেশ পালন করতে যাওয়া, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতে যাওয়া, পিতামাতার খিদমত করতে যাওয়া, ইলমী মজলিস বা জালসায় যাওয়া ইত্যাদি।

নিষিদ্ধ আমল যেমন, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা, মারধর করা, চুরি-ছিন্তাই করা, দাবা-পাশা ইত্যাদি খেলা, বিদআতী কথা বা আমল লেখা, মিথ্যা, অন্যায়, অশ্লীল অপবাদমূলক কথা, ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য ক্ষতিকর এবং আল্লাহর অবাধ্যতামূলক প্রবন্ধ লেখা।

সওয়ার হওয়া ঃ বিধেয় সওয়ার হওয়া যেমন, অভিযান, জিহাদ, হজ্জ, ইল্‌ম অনুসন্ধান, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা, পিতামাতার সেবাযত্ন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে সওয়ার হওয়া, অনুরূপ নিজের অথবা সওয়ারীর ক্ষতি না হলে আরাফাতে সওয়ার থাকা।

কোন পাপ কাজের জন্য সওয়ার হওয়া থেকে দূরে থাকা জরুরী।[১৬]
(দ্রষ্টব্য ঃ বাদাইউত তাফসীর ১/২১০-২২৩, লেখক বহু প্রকার ইবাদতের কথা উল্লেখ করেছে এবং তা শরীয়তের পাঁচটি বিধানের মানদণ্ডে ভাগ করেছেন। আমি সংক্ষেপে তার কিছু এখানে উল্লেখ করলাম; হয়তো বা তা অসমঞ্জসও হতে পারে। সুতরাং উক্ত কিতাবের প্রতি রুজু করুন, যেহেতু তা খুবই মূল্যবান।)

সুতরাং সর্বনাশ সেই ব্যক্তির জন্য, যে তার প্রতিপালকের সাথে মুনাজাতে মিথ্যা বলে। সে বলে 'ইয়্যাকা না'বুদু' (আমরা কেবল তোমরাই ইবাদত করি) অথচ বাস্তবপক্ষে সে অন্যেরও ইবাদত করে।[১৭] প্রতিপালকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে বলে, 'আমি তোমার ছাড়া আর কারো ইবাদত করি না' অথচ সে অঙ্গীকার ভঙ্গ ক'রে অন্যেরও ইবাদত করে! অবশ্য সে যদি তার এ কথায় উদ্দেশ্য হয়, ইবাদতের জন্য দুআ করা, ইবাদতের তওফীক ও সাহায্য চাওয়া, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু উক্ত আয়াতের এমন ব্যাখ্যা বড় দুর্বল। কেননা, 'ইয়্যাকা না'বুদু' আল্লাহর জন্য এবং তা তাঁর গুণকীর্তন। আর 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন' বান্দার জন্য এবং তা দুআ ও প্রার্থনা; যেমন সূরাতুস স্বালাতের হাদীসে এর উল্লেখ এসেছে। *(১০-১১পৃষ্ঠা দ্রঃ)*

বলা বাহুল্য, সকল প্রকার ইবাদত কেবলমাত্র মহান আল্লাহর জন্য নিবেদিত হওয়া ওয়াজেব। আর সাহায্য প্রার্থনা করাও এক প্রকার ইবাদত। সুতরাং যে বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাহায্য করার ক্ষমতা নেই, সে বিষয়ে অন্যের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করা বৈধ নয়

---

(১৬) আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন (স্থানের বর্কতলাভ বা যিয়ারতের) উদ্দেশ্যে (সওয়ার হয়ে) সফর করা যাবে না; আমার মসজিদ (মদীনা শরীফে মসজিদে নববী), মসজিদুল হারাম (কা'বা শরীফ) ও মসজিদে আকসা (প্যালেষ্টাইনের জেরুজালেমের মসজিদ)।" *(বুখারী ১৯৯৫, মুসলিম ১৩৯৭ নং)*

(১৭) যেমন, কোন জ্যান্ত পীরঘর বা মাযারে গিয়ে সিজদা করে, প্রার্থনা করে, সন্তান ও সুখ-সমৃদ্ধি চায়, নযর ও মানত মানে, কুরবানী পেশ করে, বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করে, রোগ-নিরাময় কামনা করে ইত্যাদি। *(অনুবাদক)*

(কারণ তা শির্ক)।

পক্ষান্তরে সাহায্য প্রার্থনায় রয়েছে পূর্ণ শক্তিমান মহান আল্লাহর কাছে বান্দার অক্ষমতা ও দুর্বলতা স্বীকার। সুতরাং প্রত্যেক তওফীকপ্রাপ্ত মু'মিন নিজের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার করে। যেহেতু তিনিই তাকে ইবাদতের তওফীক দেন এবং তার উপর সাহায্য করেন।

❁ শরয়ী ইবাদত অকৃত্রিম ভালবাসার দলীল

আল্লাহর ইবাদত এ কথার দলীল যে, ইবাদতকারী মহান আল্লাহকে সত্যিকারে ভালবাসে। তবে সে ইবাদত মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসরণ ও অনুমোদন ছাড়া শুদ্ধ হবে না। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (٣١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর ভালবাসার দাবী করে অথচ তাঁর অবাধ্যতা করে, তার দাবী মিথ্যা অথবা অবাধ্যতার পরিমাণ অনুযায়ী অসম্পূর্ণ। যেমন কবি বলেছেন,

تعصي الإله وأنت تظهر حبه   هذا محال في القياس بديع
لو كان حبك صادقاً لأطعته   إن المحب لمن يحب مطيع
في كل يوم يبتديك بنعمة   منه وأنت لشكر ذاك مضيع

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর নাফরমানি ক'রে তাঁর ভালবাসা প্রকাশ কর। এটা তো অনুমানে এক অদ্ভুত ব্যাপার!

তোমার ভালবাসা যদি সত্য হত, তাহলে অবশ্যই তুমি তাঁর আনুগত্য করতে। কারণ যে যাকে ভালবাসে সে তার অনুগত হয়।

প্রত্যেক দিন তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে নিয়ামত দান ক'রে থাকেন। আর তুমি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদাসীন। *(কবিতাটি মাহমূদ আল-অর্রাক, ইমাম শাফেয়ীরও বলা হয়, দেখুন ঃ আল-আ-দাবুশ শারইয়্যাহ ১/১৭৯)*

সুতরাং প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর শরীয়তের অনুসারী, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর আদেশ পালনকারী এবং সে নিজের খেয়াল-খুশীর অনুসারী নয়, সে ব্যক্তি সত্যিকার আল্লাহ-প্রেমী। পক্ষান্তরে অন্য ধরনের মানুষ তার ভালবাসায় (কপট ও) মিথ্যাবাদী।

এই সূরায় হাম্দ ও শুক্র (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা) একত্রিত হয়েছে। সুতরাং হৃদয় ও রসনায় প্রশংসা, গুণকীর্তন ও মহিমা বর্ণনার পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কৃতজ্ঞতার কথা স্পষ্টভাবে এসেছে। আর তা হল শরয়ী ইবাদত, যা বান্দা ক'রে থাকে।

❁ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইবাদত ও বাধ্য হয়ে ইবাদত

বান্দা যে ইবাদত ক'রে থাকে এবং যার দ্বারা সে তার প্রতিপালকের গুণকীর্তন করে, তা হল স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বেচ্ছাকৃত ইবাদত। এই শ্রেণীর ইবাদতেই সওয়াব লাভ হয়। ইবাদতকারী হয় (আল্লাহর) দাস। আর এই শ্রেণীর ইবাদত ও দাসত্ব (আল্লাহর) উলূহিয়্যাত বা উপাস্যত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

স্বেচ্ছাকৃত ইবাদত বা দাসত্ব যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا} (٦٣) سورة الفرقان

অর্থাৎ, তারাই পরম দয়াময়ের দাস, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে....। *(সূরা ফুরক্বান ৬৩ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} (٣٦) سورة الزمر

অর্থাৎ, আল্লাহ কি তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট নন? *(সূরা যুমার ৩৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} (٤٢) سورة الحجر

অর্থাৎ, বিভ্রান্তদের মধ্য হতে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার (একনিষ্ঠ) বান্দাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য থাকবে না। *(সূরা হিজ্র ৪২ বানী ইস্রাঈল ৬৫ আয়াত)*

পক্ষান্তরে বাধ্য হয়ে দাসত্ব সৃষ্টির সর্বাবস্থার ধর্ম। এমনকি কাফেরও উক্ত শ্রেণীর দাস। যেহেতু মহান আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির মালিক ও প্রভু তাঁরই হাতে স্বাধীন পরিচালনা-ক্ষমতা। *(বাদাইউত তাফসীর ১/১৩০)* সুতরাং এ দাস হল কৃতদাস। আর এই শ্রেণীর দাসত্ব (আল্লাহর) রুবূবিয়্যাত বা প্রতিপালকত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

বাধ্য হয়ে দাসত্বের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ} (٣١) سورة غافر

অর্থাৎ, আল্লাহ দাসদের প্রতি কোন যুলুম করতে চান না। *(সূরা মু'মিন ৩১ আয়াত)*

{إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا}

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে পরম দয়াময়ের নিকট দাসরূপে উপস্থিত হবে না। *(সূরা মারয়্যাম ৯৩ আয়াত)*

{قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ}

অর্থাৎ, বল, 'আমার প্রতিপালক তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার জীবিকা বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন।' *(সূরা সাবা' ৩৯ আয়াত)*

{وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ}

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে

যা কিছু আছে স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল ও সন্ধ্যায়। *(সূরা রা'দ ১৫ আয়াত)*

{وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ} (١١٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, তারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি (আল্লাহ) মহান পবিত্র। বরং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। সবকিছু তাঁরই একান্ত অনুগত। *(সূরা বাক্বারাহ ১১৬ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, এখানে দাসত্ব, সিজদাহ ও আনুগত্যের অর্থ হল, মহান আল্লাহর প্রতাপ ও প্রবলতার কাছে বশ্যতা ও হীনতার প্রকাশ।

۞ দাসত্বের মাহাত্ম্য

মানব-দানব সকল ভারপ্রাপ্তের জন্য; বরং ফিরিশ্‌তা ও সকল সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে মহৎ মর্যাদা ও কর্তব্য হল মহান প্রভুর দাসত্ব। এ কথার দলীল এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাঁর মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশের সময় 'দাস' বলে ভূষিত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

{تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ} (١) سورة الفرقان

অর্থাৎ, কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফুরক্বান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। *(সূরা ফুরক্বান ১ আয়াত)*

{وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا} (٢٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, আমি আমার দাসের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি....। *(সূরা বাক্বারাহ ২৩ আয়াত)*

{وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ} (١٩) سورة الجن

অর্থাৎ, যখন আল্লাহর দাস তাঁকে ডাকবার জন্য দন্ডায়মান হল....।

(সূরা জ্বিন ১৯ আয়াত)

এসব ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ বলেননি, আমার খলীল, আমার নবী, আমার শেষ রসূল ইত্যাদি; বরং বলেছেন 'আমার দাস'।

অনুরূপভাবে ফিরিশ্তাদের জন্য বলেছেন,

{بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (٢٦) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} (٢٧)

অর্থাৎ, বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত দাস। তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলে না এবং তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে। *(সূরা আম্বিয়া ২৬-২৭ আয়াত)*

কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, দাসত্ব সবচেয়ে বড় মর্যাদার জিনিস হল কেন?

উত্তর হল, মানব-দানব সৃষ্টি করার পশ্চাতে হিকমতই হল, ইবাদত ও দাসত্ব করা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (٥٦) سورة الذاريات

অর্থাৎ, আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। *(সূরা যারিয়াত ৫৬ আয়াত)*

সুতরাং ভারপ্রাপ্ত যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে, সে যখন তা সফল করবে, তখনই হবে মর্যাদাসম্পন্ন ও পরিপূর্ণ।

পক্ষান্তরে দাসত্ব ও ইবাদতের বিপরীতে রয়েছে অহংকার ও শির্ক। আর যে ব্যক্তি অহংকারী ও মুশরিক হবে, সে শাস্তি ও গযবের সম্মুখীন হবে এবং দাসত্বের মর্যাদা ও মানবিক পরিপূর্ণতা থেকে খারিজ হয়ে যাবে। যেহেতু সে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, সেই কর্তব্য পালন করে না।

এই অর্থ আরো পরিষ্কার ক'রে বুঝার জন্য পার্থিব উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য ঃ-

এক ব্যক্তি একটি দামী গাড়ি কিনল, কিন্তু তা অচল হয়ে গেল। এই গাড়ির কি কোন মান আছে বলছেন? এর থেকে সেই গাড়ির কি বেশি

মান নয়, যা পুরাতন ও সস্তা; কিন্তু সচল, তার মালিককে বহন ক'রে নিয়ে বেড়ায়?

একটি লোক একটি সুন্দর ও দামী কলম কিনল; কিন্তু তা লেখে না। এই কলমের কি কোন মান আছে? এই কলমের কি মান বেশী, যে কলম যার জন্য তৈরী করা হয়েছে, তাই করে না, নাকি সেই কলমের মান বেশি, যে কলম দেখতে অসুন্দর এবং দামে সস্তা; কিন্তু তার মালিক তার দ্বারা লিখতে পারে?

সেই এসির কি কোন মান আছে, যা আপনার বৈঠকখানার দেওয়ালের উপরে লাগানো আছে; কিন্তু তা অচল? পক্ষান্তরে অন্য এসি, যা নিচে রাখা আছে; কিন্তু তা সচল; এর মান কি বেশি নয়?

মহান আল্লাহ জ্বিন ও ইনসানকে এমন এক কর্তব্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোন বন্ধ নেই, বিরতি নেই। সে কর্তব্য হল, ইবাদত ও দাসত্ব। এ হল সৃষ্টি রচনার বুনিয়াদী উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেক সৃষ্টি সে কর্তব্য ত্যাগ ক'রে অবাস্তব মান ও মর্যাদার অনুসন্ধানে অন্য কর্মে রত হয়েছে। কিভাবে সে আসল মর্যাদা অর্জন করতে পারে? মর্যাদা পরিহার ক'রে কি তার অনুসন্ধান করে? সে কি হীনতা থেকে রক্ষা পেতে হীনতারই শিকার হয় না?

আসল মর্যাদা হল জরুরী কর্তব্য পালনের তওফীক লাভের মাধ্যমে। যে কর্তব্য পালনের কথা জানিয়ে নামাযের প্রত্যেক রাকআতে বান্দা নিজ প্রভুর গুণকীর্তন ক'রে থাকে। আর তার প্রভু তার প্রতি বড় মেহেরবান। যেহেতু তিনিই এ গুণকীর্তন তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং হে আল্লাহ! হে সেই সত্তা, যাঁর প্রশংসা ভাল (হওয়ার দলীল)

এবং নিন্দা খারাপ (হওয়ার দলীল)।[১৮] তুমি আমাদেরকে তোমার প্রশংসা অর্জনের তওফীক দাও এবং সেই জিনিস থেকে দূরে রাখ, যা আমাদেরকে তোমার নিন্দার সম্মুখীন করে। হে চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর!

۞ সৃষ্টির পরস্পর সাহায্য প্রার্থনা এবং সৃষ্টির স্রষ্টার কাছে সাহায্য প্রার্থনার অর্থ

সৃষ্টির পরস্পর সাহায্য প্রার্থনা করার অর্থ হল, কোন কাজ সহজ করার জন্য সহযোগিতা চাওয়া, যে কাজ একাকী করতে কষ্ট ও কঠিন লাগে।

কিন্তু এখানে সাহায্য প্রার্থনার কথা সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে। বান্দার নিজস্ব পৃথক কোন শক্তি নেই, যার দ্বারা আল্লাহর সাহায্য ছাড়াই সে নিজ অভীষ্ট লাভ করতে পারে। যেহেতু বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অনুসারী। মহান আল্লাহর ইচ্ছার অনুমোদন ব্যতীত বান্দার ইচ্ছা কখনোই পূরণ হতে পারে না। আল্লাহর ইচ্ছাই ফায়সালাকারী ও (বান্দার ইচ্ছাকে) পরিবেষ্টনকারী। যেমন তিনি বলেছেন,

{إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (٢٩) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (٣٠) سورة الإنسان

অর্থাৎ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক। তোমরা ইচ্ছা করবে না; যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা দাহর ২৯-৩০ আয়াত)*

---

(১৮) মহান আল্লাহর বাণী ঃ {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} (٤) سورة الحجرات অবতীর্ণ হওয়ার কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, একদা আক্বরা' বিন হাবেস ﵁ বললেন, 'শোনো! আমার প্রশংসা ভাল (হওয়ার দলীল) এবং নিন্দা খারাপ (হওয়ার দলীল)।' নবী ﷺ বললেন, "সে তো আল্লাহ আয্যা অজাল্ল।" *(আহমাদ, ৩/৪৮৮, তিরমিযী ৩২৬৭নং, নাসাঈ ঃ সুনান কুবরা ১১৫১৫নং, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)*

{لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّـهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (٢٩) سورة التكوير

অর্থাৎ, (এ তো শুধু বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র;) তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য। আর বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনই ইচ্ছা করতে পার না। *(সূরা তাক্বীর ২৮-২৯)*

অর্থাৎ, বান্দার যে কোন ইচ্ছা মহান আল্লাহর চূড়ান্ত ইচ্ছার অনুসারী।

এখানে সাহায্য প্রার্থনায় উদ্দেশ্য, বান্দার দুনিয়া ও আখেরাতের প্রত্যেক সেই বৈধ কাজ, যা সে করার ইচ্ছা করে। যেহেতু ইবাদতের অর্থ বড় প্রশস্ত; যেমন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। নবী ﷺ ইবনে আব্বাস ﵁-কে বলেছিলেন, "যখন তুমি সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর কাছে চেয়ো।" *(আহমাদ ১/২৯৩, ৩০৩, ৩০৭, তিরমিযী ২৫১৬নং, হাকেম ৩/৫৪২, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহুল জামে' ২/ ১৩১৮)*

তিনি ভালবাসার পাত্র মুআয ﵁-কে অসিয়ত ক'রে বলেছিলেন, "হে মুআয! আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি প্রত্যেক নামাযের পশ্চাতে অবশ্যই বলতে ছেড়ো না,

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিক্র (স্মরণ), শুক্র (কৃতজ্ঞতা) এবং সুন্দর ইবাদত করতে সাহায্য দান কর। *(আহমাদ ৫/২৪৪, আবূ দাঊদ ১৫২২, নাসাঈ ১৩০৪নং, হাকেম ১/২৭৩, ইবনে হিব্বান ২০২১নং, আলবানী সহীহুল জামে' ২/ ১৩২০তে 'সহীহ' বলেছেন।)*

۞ 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন' সবচেয়ে বেশি উপকারী দুআ

এই আয়াতটিতে রয়েছে সবচেয়ে বেশি উপকারী ও অল্প কথায় অর্থবহুল দুআ। কোন কোন উলামা বলেন, 'সবচেয়ে বেশি উপকারী

দুআর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করলাম তো দেখলাম, তা হল তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উপর সাহায্য প্রার্থনা করা। তারপর ফাতিহাতে তা দেখলাম, 'ইয়্যাকা না'বুদু অইয়্যাকা নাস্তাঈন।'

কোন কোন উলামা বলেন, 'সবচেয়ে বেশি উপকারী দুআ হল তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উপর সাহায্য প্রার্থনা করা। আর সবচেয়ে বড় দান হল উক্ত প্রার্থিত বিষয় দিয়ে সাহায্য করা। সমস্ত দুআয়ে মাসূরার মৌলিক বিষয় হল এই (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপর সাহায্য প্রার্থনা) এবং তার প্রতিকূল বিষয় ও বস্তু দূর করা, তা পরিপূর্ণ করা এবং তার কারণসমূহ সহজ করা।' *(বাদাইউত তাফসীর ১/ ১৮০)*

সুতরাং কি সুন্দর অর্থবহুল এ দুআ! প্রত্যেক বিধেয় দুআর মৌলিক বিষয় এই দুআর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।

۞ 'ইয়্যাকা না'বুদু অইয়্যাকা নাস্তাঈন'-এ রয়েছে তওহীদ ও বিনয়

'ইয়্যাকা না'বুদু'-তে রয়েছে শির্ক বর্জন ও তওহীদ বরণের প্রতি ইঙ্গিত। এতে রয়েছে শির্ক ও রিয়া (লোকপ্রদর্শনের আমল)এর সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা। যেহেতু এতে দুআকারী ইবাদতকে কেবল আল্লাহর জন্য সীমিত করে। এর দলীল হল, কর্মকারক (ইয়্যাকা)কে ক্রিয়া (না'বুদু)র পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আর 'অইয়্যাকা নাস্তাঈন'-এ রয়েছে বান্দার আত্মনির্ভরতা বর্জন করার প্রতি ইঙ্গিত। শক্তিমত্তা, সক্ষমতা ও অহংকারের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা। এতে রয়েছে আনুষঙ্গিকভাবে অক্ষমতা ও দুর্বলতার কথা স্বীকার এবং কেবল সৃষ্টিকর্তার মহাশক্তির কথা অনুভব ও কল্পনা। যেহেতু বান্দা এতে সাহায্য প্রার্থনাকে কেবল আল্লাহর জন্য সীমিত করে।

কোন কোন উলামা বলেন, "ইয়্যাকা না'বুদ' রিয়া (লোকপ্রদর্শন) দূর

করে এবং 'অইয়্যাকা নাস্তাঈন' অহংকার দূর করে।" *(মাজমূউ ফাতাওয়া ১/ ১৫৭)*

'ইয়্যাকা না'বুদু'তে তওহীদের সাক্ষ্য (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)র অর্থ ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে নিহিত রয়েছে। আর তা তাওহীদুল উলূহিয়্যাতের সাথে সম্পৃক্ত। পক্ষান্তরে 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন' তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহর সাথে সম্পৃক্ত। *(বাদাইউত তাফসীর ১/ ১১০, ১৭৭)* যাতে মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা ও স্বাধীন পরিচালনার কথা বুঝা যায়। আর এ কথাও বুঝা যায় যে, সমস্ত সৃষ্টি নিজের ইচ্ছামত কিছু করতে অক্ষম; যদি না আল্লাহ তকদীর দ্বারা তাদের সাহায্য করেন। তিনি বলেছেন,

{وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (٢٩) سورة التكوير

অর্থাৎ, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনই ইচ্ছা করতে পার না। *(সূরা তাকবীর ২৯ আয়াত)*

'ইয়্যাকা' সীমিতকরণের অর্থ দেয়। যেহেতু তা (কর্মকারক ক্রিয়ার) পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং এর সাথে অন্য (কোন কর্মকারকের) সংযোগ শুদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে যদি 'না'বুদুকা' বলা হত, তাহলে তার সাথে সংযোগ করা শুদ্ধ হত। আর তখন তা তওহীদের প্রতি ইঙ্গিত করত না।

এই আয়াতের অর্থের নিকটবর্তী আয়াত হল নিম্নের আয়াত,

{فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ} (١٢٣) سورة هود

অর্থাৎ, তুমি তাঁর উপাসনা কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। *(সূরা হূদ ১২৩ আয়াত)*

যেহেতু আল্লাহর উপর নির্ভরকারী আসলে আল্লাহর কাছে সাহায্য

প্রার্থনাকারী।[১৯]

۞ 'ইয়্যাকা না'বুদু অইয়্যাকা নাস্তাঈন'-এ জাবারিয়্যাহ ও ক্বাদারিয়্যাহর মতবাদের খণ্ডন

'আমরা ইবাদত করি' কথার মধ্যে জাবারিয়্যাহ ফির্কার মতবাদ খণ্ডন হয়, যারা বলে, বান্দার কোন ইচ্ছা, ইরাদা ও কর্ম নেই। বরং সে বাতাসে চলমান পালকের মত। (তকদীরই সবকিছু, তদবীর বলে কিছু নেই।)

খণ্ডন এইভাবে হয় যে, আয়াতে ইবাদতের কর্তা হল বান্দাই। ইবাদত-ক্রিয়াকে তার প্রতিই সম্পৃক্ত করা হয়েছে। (তাহলে বুঝা গেল, বান্দার ইচ্ছা ও কর্ম অবশ্যই আছে।)

আর 'সাহায্য চাই' কথায় রয়েছে ক্বাদারিয়্যাহ ফির্কার মতবাদের খণ্ডন, যারা বলে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই বান্দা নিজের কাজের সৃষ্টিকর্তা। (তদবীরই সবকিছু, তকদীর বলে কিছু নেই।)

তাদের মতবাদের খণ্ডন এইভাবে হয় যে, বান্দার সাহায্য প্রার্থনা এ কথার দলীল যে, তার ইচ্ছা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া পূরণ হবার নয়। সুতরাং আল্লাহর সাহায্য না থাকলে বান্দা ইবাদত করতে সক্ষম হবে না। কর্ম বান্দার পক্ষ হতে এবং তার সংঘটন-নিয়তি ও সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে। *(মাদারিজুস সালেকীন ১/১০৭)*

(১৯) বাস্তবপক্ষে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার চাইতে বেশি ব্যাপক। সূরা স্বালাতের হাদীসের এক বর্ণনায় 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন'কে সোপর্দ করার অর্থে আরোপ করা হয়েছে। উলামাগণ বলেন, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা---সকল কর্ম সোপর্দ করা, সাহায্য প্রার্থনা করা ও সন্তুষ্ট থাকা---এ সবে পরিব্যাপ্ত আছে। এ সকল ছাড়া আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা কল্পনাই করা যায় না। *(মাদারিজুস সালেকীন ১/১৩৬)*

۞ মানুষ ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনায় চার ভাগে বিভক্ত

১। প্রকৃত বান্দা ঃ যে ব্যক্তি অবস্থা অনুপাতে ভারসাম্য রক্ষা ক'রে ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনা একত্রে উভয়ই করে। যেমন আয়াতে উভয়কে একত্রে জমা করা হয়েছে। সুতরাং একটা করতে গিয়ে অন্যটাকে উপেক্ষা করে না।

২। যার কাছে ইবাদত আধিক্য লাভ করে; কিন্তু সাহায্য প্রার্থনা ও আল্লাহর উপর ভরসায় তার ত্রুটি আছে। ফলে সে অক্ষম হয় অথবা অবহেলার শিকার। তখন সে মুসীবতে অনেক উদ্বিগ্ন হয়, হাতছাড়া হওয়া জিনিসের জন্য অনেক দুঃখিত হয়, ভাগ্য ও তকদীরের অনেক বিধান ও হিকমত সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, অথবা সৃষ্টির সাথে আশা বেঁধে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাদের শক্তি ও সাহায্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

৩। যার কাছে সাহায্য প্রার্থনা ও আল্লাহর উপর ভরসা আধিক্য লাভ করে; কিন্তু সে ইবাদতে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। শরীয়ত, আদেশ-নিষেধ ও উলূহিয়্যাত রক্ষার ব্যাপারে অবহেলা করে। ভাগ্য, তকদীর ও রুবূবিয়্যাতকে সর্বদা সামনে রাখে, তারই কথা খেয়াল করে এবং শরীয়ত, আদেশ-নিষেধ ও উলূহিয়্যাতকে সামনে রাখে না।

৪। যে একত্রে উভয়ের ব্যাপারেই শৈথিল্য করে। সুতরাং দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে, অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং দুনিয়ার ব্যাপারে ইচ্ছামত দুনিয়া চায়; তার উদ্দেশ্য হয় দুনিয়াই। দুনিয়া চায় হেতুর উপর নির্ভর ক'রে; হেতু সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ)র উপর নির্ভর করে না। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ১৪/১০-১২)*

۞ এই আয়াতে ইবাদতকে সাহায্য প্রার্থনার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে কেন?

এ ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে ঃ-

বলা হয়েছে, ফাতিহা দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগ আল্লাহর, অপর ভাগ বান্দার---যেমন পূর্বে উল্লিখিত হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ইবাদতের কথা প্রথমে বলা হয়েছে, যাতে সূরার প্রথম ভাগের বাক্যগুলিতে মহান আল্লাহর যে সকল গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, তার সাথে সুসমঞ্জস হয়। আর সাহায্য প্রার্থনার কথা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে সূরা শেষ ভাগের বাক্যগুলিতে বান্দার যে প্রার্থনা বর্ণিত হয়েছে, তার সাথে সুসমঞ্জস হয়।

বলা হয়েছে, যেহেতু ইবাদত হল অভীষ্ট, আর সাহায্য প্রার্থনা হল তার মাধ্যম। সুতরাং মাধ্যম অপেক্ষা অভীষ্ট উত্তম বলে তার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

বলা হয়েছে, যেহেতু ইবাদত উলূহিয়্যাতের সাথে সম্পৃক্ত এবং সাহায্য প্রার্থনা রুবূবিয়্যাতের সাথে সম্পৃক্ত। আর সূরাতে উলূহিয়্যাতের কথা 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন' পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।[২০]

বলা হয়েছে, যেহেতু ইবাদতের মাঝেও সাহায্য প্রার্থনা আছে। অতএব ইবাদত হল ব্যাপক। আর সাহায্য প্রার্থনা করলে (পূর্ণ) ইবাদত হওয়া জরুরী নয়। প্রবৃত্তিপূজারী ও পাপী মানুষও তার প্রবৃত্তিপূজা ও পাপের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে। তাই এমন এক কর্মকে আগে উল্লেখ করা হল, যা বান্দার নেক আমল। আর সেই কর্মকে পিছিয়ে দেওয়া হল, যা কখনো নেকও হতে পারে, কখনো বদও।

বলা হয়েছে, যেহেতু ইবাদত বিচার দিনের প্রতিদানের সাথে

(২০) অবশ্য এ কথা সঠিক মতের সাথে সম্পৃক্ত যে, 'বাসমালাহ' সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত নয়।

সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার কথা তার পূর্বের আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। আর সাহায্য প্রার্থনা হিদায়াত প্রার্থনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা তার পরবর্তী আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

অবশ্য এ সকল উক্তির মধ্যে প্রথমটাই বেশি যুক্তিসঙ্গত।

۞ ভারপ্রাপ্ত বান্দা কর্তৃক কোন্‌টা আগে ঘটে ঃ ইবাদত, নাকি সাহায্য প্রার্থনা?

এ প্রশ্নের উত্তর পূর্বোক্ত আলোচনায় রয়েছে, আয়াতে কেন সাহায্য প্রার্থনার আগে ইবাদতকে উল্লেখ করা হল? যাতে বুঝা যায় ইবাদতই আগে হয়। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, সংঘটনের দিক দিয়ে একটি অন্যটির আগে ঘটে না। বরং উভয়ই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একটির আগে অন্যটির ঘটা মোটেই সম্ভব নয়। ইবাদত আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা ছাড়া ঘটতে পারে না। আর সাহায্য প্রার্থনাও একটি ইবাদত, যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে চাওয়া বৈধ নয়; যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে। এই আয়াতে সাধারণ ইবাদত সম্পর্কে বিবৃতি এসেছে। তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, আর তা হল সাহায্য প্রার্থনা করা। যাতে এই বিশেষ ইবাদতের বিশেষ গুরুত্ব স্পষ্ট হয়।

পঞ্চম আয়াত

[اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ]

অর্থাৎ, আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।

এ হল বান্দার যে সব জিনিস প্রয়োজন তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস প্রার্থনা ক'রে দুআ। বরং বান্দা তার নেহাতই মুখাপেক্ষী। (সরল পথের দিশা।)

এ প্রার্থনায় বান্দা নিজের অক্ষমতা স্বীকার ক'রে তার প্রতিপালকের কাছে প্রয়োজন ভিক্ষা করবে। যেহেতু মানুষ "অতিশয় যালেম ও অতিশয় অজ্ঞ।" *(সূরা আহযাব ৭২ আয়াত)*

এ দুআয় সে হক কথা শোনাতে অহংকার ও হঠধর্মিতা দূর করার চেষ্টা করবে।[২১]

এ কথা স্বীকার করবে যে, দুআ একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই করতে হবে। তিনিই সাহায্যকারী, তওফীকদাতা এবং (হিদায়াতের পথ) সহজকারী।

এ দুআতে সে হিদায়াত ও সরল পথ লাভ করার আকুল আগ্রহ প্রকাশ করবে। যেমন এ দুআয় সে অনুনয়-বিনয়কারী হবে; যেমন মহান আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন,

{ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (৫৫) سورة الأعراف

অর্থাৎ, তোমরা কাকুতি-মিনতি সহকারে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ

(২১) অহংকারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "হক বা সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।" *(মুসলিম ২৬৫নং)*

করেন না। *(সূরা আ'রাফ ৫৫ আয়াত)*

۞ হিদায়াতের অর্থ

আভিধানিক অর্থে 'হিদায়াত' গুমরাহী ও ভ্রষ্টতার বিপরীত। হিদায়াত করার মানে হল, নম্রতা ও কোমলতার সাথে পথ দেখানো, পথে চালানো।[২২]

শরয়ী পরিভাষায় দু'টি প্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহার হয় ঃ-

১। পথ দেখানো, পথ-নির্দেশ করা। আর এ কাজ স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয় কর্তৃকই হতে পারে। সুতরাং মহান আল্লাহ পথ দেখান। যেমন তিনি বলেন,

{وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى} (১৭) سورة فصلت

অর্থাৎ, সামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি ওদেরকে পথনির্দেশ করেছিলাম; কিন্তু ওরা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিল। *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ১৭ আয়াত)*[২৩]

আর রসূল ও সালেহীনগণও পথ দেখান। যেমন মহান আল্লাহ তাঁর রসূল ﷺ সম্পর্কে বলেন,

{وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (৫২) سورة الشورى

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর। *(সূরা শূরা ৫২ আয়াত)*

নবী ﷺ (আলী ﷺ-কে) বলেছিলেন, "তোমার দ্বারা যদি একটি লোক

(২২) কিন্তু এ অর্থ কাফেরদের ক্ষেত্রে সমঞ্জস নয়। মহান আল্লাহ বলেন, {فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ} অর্থাৎ, ওদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত কর। *(সূরা স্বাফফাত ২৩ আয়াত)* এর জবাবে বলা হয়েছে, এটি ব্যঙ্গ ক'রে বলা হয়েছে। *(রূহুল মাআনী ১/১৫২)* উলামাগণ বলেন, এখানে হিদায়াতের অর্থ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া; জান্নাত অথবা জাহান্নামে। *(২৫নং টীকা দ্রষ্টব্য)*

(২৩) উভয় প্রকার হিদায়াতের দলীলের জন্য দেখুন ঃ আযওয়াউল বায়ান, শানক্বীত্বী ৪/৩৯৯, সূরা হা-মীম সাজদাহ ১৭ আয়াত

পথের দিশা পায়, তাহলে তা তোমার জন্য লাল উটনী অপেক্ষা উত্তম।” *(বুখারী ২৯৪২, মুসলিম ৬২২৩নং)*

কুরআন (শরয়ী আয়াত) হিদায়াত করে, পথ দেখায়, পথ বর্ণনা করে, পথ স্পষ্ট করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ}

অর্থাৎ, আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের জন্য, পথনির্দেশ, করুণা ও সুসংবাদ স্বরূপ। *(সূরা নাহল ৮৯ আয়াত)*

দিকচক্রবালে (সৃষ্টিগত নিদর্শনাবলীতে) ও নিজ দেহের মধ্যে দৃষ্টিপাত মানুষকে হিদায়াত করে ও পথ দেখায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ}

অর্থাৎ, আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বজগতে ব্যক্ত করব এবং ওদের নিজেদের মধ্যেও; ফলে ওদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ (কুরআন) সত্য। *(সূরা হামীম সাজদাহ ৫৩ আয়াত)*

বরং এই শ্রেণীর হিদায়াত কাগজের কিতাব অথবা ইলেক্ট্রনিক পুস্তক, অডিও অথবা ভিডিও ক্যাসেটও করতে পারে।

পথ দেখানোর হিদায়াত থেকে উদ্দেশ্য হল ভাল চিনিয়ে দেওয়া, বয়ান ক'রে দেওয়া। তাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তা গ্রহণ করুক অথবা বর্জন করুক। সুতরাং এই হিদায়াত দ্বিতীয় শ্রেণীর হিদায়াতের জন্য শর্ত; অনিবার্য সংঘটক নয়। আর শর্ত না পাওয়া গেলে (মাশরূত বা যার জন্য শর্ত আরোপিত হয় তা) পাওয়া যাবে না। কিন্তু শর্ত পাওয়া গেলে (মাশরূত) পাওয়া জরুরী নয় এবং শর্তও না পাওয়া জরুরী নয়। সুতরাং পথ দেখানোর হিদায়াত পাওয়া যায় এবং তওফীক ও ইলহামের হিদায়াত না পাওয়া যায়, তাহলে সেই হিদায়াত লাভ হবে না, যাতে সওয়াব পাওয়া যায়।

২। তওফীক ও ইলহামের হিদায়াত। আর এটি মহান আল্লাহর জন্য খাস। মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী এই অর্থের উপরই আরোপিত হবে। তিনি বলেছেন,

{لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءِ} (٢٧٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার দায়-দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭২ আয়াত)*

{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءِ} (٥٦) سورة القصص

অর্থাৎ, কাকেও প্রিয় মনে করলে তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনেন। *(সূরা ক্বাস্বাস ৫৬ আয়াত)*

এখানে যে হিদায়াত রসূল ﷺ থেকে খণ্ডন করা হয়েছে, তা হল সেই হিদায়াত, যাতে সৎপথ ও সওয়াব জরুরী হয় এবং তার অন্যথা হয় না।

তওফীক দান ও ইলহাম করার হিদায়াত সৃষ্টির হাতে মোটেই নেই। সৃষ্টির হাতে সেই হিদায়াত আছে, যা রসূলদের হাতে আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ } (٣٥) سورة النحل

অর্থাৎ, রসূলদের কর্তব্য সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা ছাড়া আর কি? *(সূরা নাহল ৩৫ আয়াত)*

তওফীক ও ইলহামের হিদায়াত দান থেকে উদ্দেশ্য হল, হৃদয়ে ঈমান প্রক্ষিপ্ত করা, হৃদয়ের তা গ্রহণ করা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা। সুতরাং মহান আল্লাহই নিজ রহমত ও অনুগ্রহে ভারপ্রাপ্ত বান্দার বক্ষকে ঈমানের জন্য উন্মুক্ত ক'রে দেন এবং ইসলামী শরীয়ত দ্বারা আমল করার তওফীক দান করেন। যেমন তিনিই বান্দাকে ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে দেন এবং নিজ ইনসাফ ও হিকমতের সাথে ভারপ্রাপ্ত বান্দার বক্ষকে সংকীর্ণ ক'রে দেন, ফলে সে শরীয়তকে বরণ করতে পারে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

{فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ} (١٢٥) سورة الأنعام

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করার ইচ্ছা করলে, তিনি তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য প্রশস্ত ক'রে দেন এবং কাউকে বিপথগামী করার ইচ্ছা করলে, তিনি তাঁর হৃদয়কে অতিশয় সংকীর্ণ ক'রে দেন; তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদের উপর এরূপে অপবিত্রতা (শয়তান অথবা আযাব) নির্ধারিত করেন। *(সূরা আনআম ১২৫ আয়াত)*

আপনি বলতে পারেন যে, তওফীক ও ইলহামের হিদায়াত মহান আল্লাহর জন্য খাস; চাহে সে হিদায়াত শরয়ী ব্যাপারে হোক অথবা পার্থিব ব্যাপারে হোক, উভয় হিদায়াতই সমান সমান।

শরয়ী ব্যাপারে হিদায়াত যেমন, দ্বীনের আহবায়ক যাকাত আদায়ের জন্য আহবান করেন। স্পষ্ট ভাষায় যাকাত আদায়ের উপকারিতা, বর্কত ও দুনিয়া-আখেরাতে মঙ্গলের কথা বর্ণনা করেন। ফলে আল্লাহ যার মঙ্গল চান, সে এই আহবানে সাড়া দেয়। পক্ষান্তরে অন্য লোকেরা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

পার্থিব ব্যাপারে হিদায়াত যেমন, আপনি ড্রাইভারকে নসীহত করলেন, যাতে সে ধীর-স্থিরভাবে গাড়ি চালায়। আপনি তাকে সুন্দরভাবে স্পষ্ট কথার মাধ্যমে এর উপকারিতাও বললেন। কিন্তু আপনি যার দিকে আহবান করলেন, তা সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সে আপনার কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না তথা তাতে আমল করল না।

কখনো প্রচেষ্টা বড় সফল মনে হয়। আপনি পছন্দ করেন এমন এক

লোককে আন্তরিকতার সাথে নসীহত করলেন। কখনো কখনো আপনি হঠাৎ দেখবেন, যার সাথে আপনি কথা বলছেন, সে এ বিষয়ে আদৌ আগ্রহ রাখে না। তখন আপনি তাঁর হৃদয়কে সেদিকে ফিরাতে পারবেন না, যেদিক ফিরাতে তকদীরগতভাবে আল্লাহর ইচ্ছা নেই। সুতরাং আপনার শেষ সীমা ও ইচ্ছার শেষ পর্যায় হল দ্বীন-দুনিয়ার ব্যাপারে পথ দেখানোর হিদায়াত। (বাকী আল্লাহর হাতে।)

মহান আল্লাহই হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী, আবর্তনকারী। এই জন্য রসূল ﷺ-এর অধিকাংশ দুআ ছিল,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْب ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ.

অর্থাৎ, হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। *(আহমাদ ৬/৯১, ৩০২, ৩১৫, তিরমিযী ৩৫২২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৯১নং)*

তাঁর অধিকাংশ কসম ছিল 'লা অমুস্বার্রিফিল কুলূব' বলে *(নাসাঈ ৩৭৬২, ইবনে মাজাহ ২০৯২, ত্বাবারানী ১৩১৬৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৯০নং)* এবং 'লা অমুক্বাল্লিবিল কুলূব' বলে। *(বুখারী ৭৩৯১নং)*

অর্থাৎ, হৃদয় পরিবর্তনকারী (আল্লাহ)র কসম! না।

۞ সূরা ফাতিহায় হিদায়াতের উদ্দেশ্য

সূরা ফাতিহা পাঠ ক'রে দুআকারী তাতে দুই শ্রেণীর হিদায়াত প্রার্থনা ক'রে থাকে ঃ-

১। পথ দেখানো হিদায়াত; আর তা হল হকের অনুকূল উপকারী ইল্ম। আর তা হল তাত্ত্বিক জ্ঞানশক্তি। এর সূক্ষ্ম প্রাপ্তি হল, বিতর্কিত বিষয়াবলীতে হিদায়াত (সঠিক পথ) লাভ। মুজতাহিদ (ভুল করলেও) একটি সওয়াবের অধিকারী; কিন্তু যিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তিনি লাভ করেন দু'টি সওয়াব। নবী ﷺ রাতের নামায এই দুআ পড়ে আরম্ভ করতেন,

اَللّهُمَّ رَبَّ جِبْرَآئِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَآفِيْلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইস্রাফীলের প্রভু! হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! তুমি তোমার বান্দাদের মাঝে মীমাংসা কর, যে বিষয়ে ওরা মতভেদ করে। যে বিষয়ে মতভেদ করা হয়েছে, সে বিষয়ে তুমি আমাকে তোমার অনুগ্রহে সত্যের পথ দেখাও। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখিয়ে থাক। *(মুসলিম ৭৭০নং)*

২। তওফীক ও ইলহামের হিদায়াত; আর তা হল হৃদয়ের হক গ্রহণ করা, হক নিয়ে হৃদয় প্রশস্ত হওয়া, হককে ভালবাসা এবং হকের উপর আমল করা। আর এটাই হল ইচ্ছাগত কর্মশক্তি।[২৪]

দুআকারী এই হিদায়াত আল্লাহর কাছে চায়। যেহেতু তিনিই এর প্রার্থনাস্থল। তিনি বলেছেন,

{وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (٧) فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (٨) سورة الحجرات

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমান (বিশ্বাস)কে প্রিয় করেছেন এবং ওকে তোমাদের হৃদয়ে সুশোভিত করেছেন। আর কুফরী (অবিশ্বাস), পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করেছেন। ওরাই

[২৪] তাত্ত্বিক জ্ঞানশক্তি এবং ইচ্ছাগত কর্মশক্তির কথা জানতে দেখুন ঃ বাদাইউত তাফসীর ১/১০৮, বিস্তারিত দেখুন ঃ মানাযিলুল ইবাদ বাইনাল কুউওয়াতিল ইলমিয়্যাহ অল-কুউওয়াতিল আমালিয়্যাহ, হিশাম আলে উক্বদাহ।

সৎপথ অবলম্বনকারী। (এটা) আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ; আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা হুজুরাত ৭-৮ আয়াত)*

আর মু'মিনগণ পরকালে বলবে,

{الْحَمْدُ للّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ}

অর্থাৎ,'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই; যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে পথ না দেখালে, আমরা কখনও পথ পেতাম না। *(সূরা আ'রাফ ৪৩ আয়াত)*

এ সূরায় উক্ত উভয় প্রকার হিদায়াতই উদ্দিষ্ট, তার দলীল এই যে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ}

তিনি বলেননি,

{اهدِنَا إِلى الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ} অথবা {اهدِنَا للصِّرَاطَ المُستَقِيمَ}

যাতে হিদায়াতের ব্যাপক অর্থ নির্দেশ করে।[২৫]

[২৫] হিদায়াতের চারটি শ্রেণী আছে। উপরে যা বর্ণিত হয়েছে, তা হল দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী। এর প্রথম শ্রেণী হল, আম হিদায়াত, যা সকল সৃষ্টির মাঝে ব্যাপক। মহান আল্লাহ বলেন,

{قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} (٥٠) سورة طـه

অর্থাৎ, মূসা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন।' *(সূরা ত্বাহা ৫০ আয়াত)*

সুতরাং তিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার নিজস্ব আকার-আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক অঙ্গকে তার উপযুক্ত রূপ দান করেছেন। তা যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পথনির্দেশ ক'রে কর্তব্য জানিয়ে দিয়েছেন। আর প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য রয়েছে এই হিদায়াতের উপযুক্ত অংশ।

আর চতুর্থ শ্রেণীর হিদায়াত হল, অন্তিম অভীষ্ট। আর তা হল জান্নাত অথবা জাহান্নামের প্রতি পৌঁছে দেওয়া। মহান আল্লাহ জান্নাতীদের সম্পর্কে বলেন,

{الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ} (٤٣) سورة الأعراف

অর্থাৎ,'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই; যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে পথ না দেখালে, আমরা কখনও পথ পেতাম না। *(সূরা আ'রাফ ৪৩ আয়াত)*

۞ স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীমের ব্যাখ্যা এবং সরল ও বাঁকা পথের মাঝে পার্থক্য

‘স্বিরাত্ব’ মানে স্পষ্ট রাস্তা। এ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে صرط الطعام থেকে। এর অর্থ খাবার গিলে নেওয়ার পর খাদ্যনালীতে চলমান হওয়া।

আর ‘মুস্তাক্বীম’ (সরল বা সোজা) বক্র বা বাঁকার বিপরীত। সরল রেখা সেটাই, যা দুই বিন্দুর মাঝে সবচেয়ে নিকটবর্তী। ‘স্বিরাত্বে মুস্তক্বীম’ (সরল পথ)ও সেই নিকটতম পথ, যা বান্দাকে তার প্রতিপালকের কাছে এবং সম্মানজনক গৃহ বেহেশ্তে পৌঁছে দেয়।

সূরা ফাতিহায় এর উদ্দেশ্য হল, হক জানা ও চেনা এবং সেই অনুযায়ী আমল করা। যেহেতু এই জিনিসই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি তথা বেহেশ্তে পৌঁছে দেবে।

পক্ষান্তরে বাঁকা বা টেরা পথ সোজা পথ হতে অনেক দূরবর্তী; যদি উভয়ের শুরু ও শেষ একই হয়। আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

বাঁকা পথে চললে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে দেরী হবে, পক্ষান্তরে সরল পথ সহজভাবে সত্বর ঠিকানায় পৌঁছে দেবে।

সরল পথ পথিকের জন্য স্পষ্ট ও নিরাপদ, পক্ষান্তরে টেরা পথ অস্পষ্ট,

---

আর জাহান্নামীদের ব্যাপারে বলেন,

{احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ}

অর্থাৎ, (ফিরিশ্তাদেরকে বলা হবে,) একত্র কর অত্যাচারীদেরকে, ওদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের ওরা উপাসনা করত; আল্লাহর পরিবর্তে এবং ওদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত কর। *(সূরা স্বাফ্ফাত ২২-২৩ আয়াত)*

সূরা ফাতিহায় প্রার্থনীয় হিদায়াত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর হিদায়াত, যা আমরা প্রথমে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। *(দ্রষ্টব্য ঃ মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআন ৮৩৫পৃঃ, বাদাইউত তাফসীর ১/২৫১-২৫২)*

যা ধাঁধায় ফেলে, মনে ভয় সৃষ্টি করে।

আবার অনেক টেরা পথ গন্তব্যস্থলে না গিয়ে অন্য দিকে যায়। বলা বাহুল্য, মুনাফিক, মুশরিক, কাফের, আহলে কিতাব প্রভৃতি অমুসলিমগণ, যারা শেষ নবী ﷺ-এর আগমন-বার্তা শোনার পরেও তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি এবং তাঁর অনুসরণ করেনি, তাদের পথ আল্লাহ-গামী নয়। বরং তাদের পথ দোযখ-গামী, আর বড় নিকৃষ্ট সে ঠিকানা। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক।[২৬]

---

(২৬) অনেক ধর্ম-নিরপেক্ষবাদী, যারা ‘সব ধর্ম সমান’ বলেন, তাঁরা বলে থাকেন, ‘বিভিন্ন নদ-নদীর উৎসমুখ ও প্রবাহ পথ ভিন্ন হলেও সব একই সমুদ্রে গিয়ে মিশে। সকলের মত ও পথ বিভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য সেই একই বিধাতার সন্তুষ্টিবিধান।’ কিন্তু সকল নদী একই মিলনক্ষেত্রে পৌঁছে না। বিভিন্ন সমুদ্রে গিয়ে মিশে, কারো পানি মিঠা, কারো, লবণাক্ত, কারো বা অন্যকিছু। যে নদী মিঠা-সাগরে বা শান্তি-সিন্ধুতে গিয়ে মিলেছে তা একমাত্র ইসলাম নদীই।

‘একটি অঙ্ককে বিভিন্ন নিয়মে কষা যায়, উত্তরও একই বা সঠিক হয়।’ কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে অঙ্ক কষতে দিয়েছেন তার পদ্ধতি মাত্র একটাই, ইসলাম পদ্ধতি। অন্য কোন মনগড়া ‘প্রসেস’-এ উত্তর সঠিক হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٨٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। *(সূরা আলে ইমরান ৮৫ আয়াত)*

‘পথ বিভিন্ন হলেও গন্তব্যস্থল একটাই।’ এ অন্য কোন সাধারণ গন্তব্যস্থলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু যে গন্তব্যস্থলে আল্লাহকে পাওয়া যায় তার জন্য পথ একটাই। এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দু পর্যন্ত সরল রেখা টানলে মাত্র একটি রেখাই টানা সম্ভব। দুই বা তার অধিক রেখা টানতে গেলে---হয় তা অপর বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছবে না, নতুবা রেখা সরল হবে না। সেই একটি সরল রেখাই আল্লাহর পথ, ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١٥٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন ক’রে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা সাবধান হও। *(সূরা আনআম ১৫৩ আয়াত)*

তওহীদবাদী ফাসেক তার ফিস্‌ক (পাপাচার) অনুযায়ী টেরা পথে থাকে। (বিনা তওবায় মারা গেলে) পরকালে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে; তিনি ইচ্ছা করলে তাকে তার পাপ অনুযায়ী শাস্তি ভুগিয়ে পরিশেষে একদিন বেহেশ্‌তে দেবেন। নচেৎ (তওহীদের গুণে) তার পাপ মাফ ক'রে দিয়ে সরাসরি বেহেশ্‌ত দান করবেন।

۞ স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম সম্বন্ধে উলামাগণের মতামত

কেউ কেউ বলেন, 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম' বা সরল পথ বলতে উদ্দেশ্য ইসলাম। এর দলীল মহান আল্লাহর বাণী,

{فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ} (١٢٥) سورة الأنعام

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করার ইচ্ছা করলে, তিনি তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য প্রশস্ত ক'রে দেন।

এর পরবর্তী আয়াতে তিনি বলেছেন,

{وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا} (١٢٦) سورة الأنعام

অর্থাৎ, আর এটিই তোমার প্রতিপালক নির্দেশিত সরল পথ। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি। *(সূরা আনআম ১২৫-১২৬ আয়াত)*

নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ সরল পথের উপমা বর্ণনা করেছেন। পথের দু' ধারে আছে দু'টি প্রাচীর। প্রাচীরে আছে অনেক খোলা দরজা। সকল দরজাতেই পর্দা লটকানো আছে। পথের মাথায় একজন আহবায়ক আহবান করছে, 'হে লোক সকল! তোমরা সকলেই (সরল) পথে প্রবেশ

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ বলেন, একদা রসূল ﷺ স্বহস্তে একটি (সরল) রেখা টানলেন, অতঃপর বললেন, "এটা আল্লাহর সরল পথ।" তারপর ঐ রেখাটির ডানে ও বামে আরো অনেক রেখা টেনে বললেন, "এই হচ্ছে বিভিন্ন পথ; যার প্রত্যেকটির উপর রয়েছে শয়তান, যে ঐ পথের দিকে আহবান করে (দাওয়াত দিতে) থাকে।" অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন। *(অনুবাদক)*

কর এবং বাঁকা পথে যেয়ো না।' অন্য একজন আহবানকারী পথের উপর থেকে আহবান করছে। যখনই কোন মানুষ প্রাচীর-গাত্রের কোন দরজা খুলতে উদ্যত হয়, তখনই সে বলে, 'ধ্বংস তোমার! দরজা খুলো না। কারণ তুমি দরজা খুললেই, তাতে প্রবেশ ক'রে যাবে।' পথ হল ইসলাম। দুই প্রাচীর হল আল্লাহর গন্ডিসীমা। খোলা দরজাসমূহ হল আল্লাহর হারামকৃত বস্তুসমূহ। পথের মাথায় আহবানকারী হল আল্লাহর কিতাব। পথের উপরে আহবানকারী হল প্রত্যেক মুসলিমের হৃদয়ে অবস্থিত আল্লাহর উপদেষ্টা (ফিরিশ্‌তা)।" *(আহমাদ ৪/ ১৮২-১৮৩, তিরমিযী ২৮৫৯, নাসাঈ সুনান কুবরা ৯/৬ ১, হাকেম ১/৭৩, ইবনে কাসীর ১/২৭, আলবানী মিশকাতে সহীহ বলেছেন ১/৬৭)*

কেউ কেউ বলেছেন, 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম' বা সরল পথ বলতে উদ্দেশ্য কুরআন অনুসারে আমল করা। এর দলীল মহান আল্লাহর এই বাণী,

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } (١٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! আমার রসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে, সে তার অনেক অংশ তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক কিছু (প্রকাশ না ক'রে) উপেক্ষা ক'রে থাকে। অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট হতে জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এ (জ্যোতির্ময় কুরআন) দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে (কুফরীর) অন্ধকার হতে বার ক'রে (ঈমানের) আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। *(সূরা মাইদাহ ১৫-১৬ আয়াত)*

কেউ কেউ বলেছেন, 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম' হল একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। এর দলীল হল মহান আল্লাহর এই বাণী,

{وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ} (٦١) سورة يـــس

অর্থাৎ, আমারই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ। *(সূরা ইয়াসীন ৬১ আয়াত)*

কেউ কেউ বলেছেন, তা হল নবী ﷺ-এর আনুগত্য করা। এর দলীল মহান আল্লাহর এই বাণী,

{وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٥٢) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ} (٥٣) سورة الشورى

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর---সেই আল্লাহর পথ যাঁর মালিকানায় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই। জেনে রেখো, সকল পরিণাম আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তন করে। *(সূরা শূরা ৫২-৫৩ আয়াত)*

কেউ কেউ বলেছেন, তা হল আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)র পথ অনুসরণ করা। কারণ উভয়ের অনুসরণে আসলে নবী ﷺ-এর অনুসরণ করা হয়।

উপর্যুক্ত প্রত্যেকটি উক্তিই মাত্র একটি উক্তির দিকে ফিরে আসে, আর তা হল, দুই সাক্ষির অর্থ প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ, কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করা, আর তা হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যদানের অর্থ। এবং কেবল রসূল ﷺ-এর আনুগত্য করা, আর তা হল 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্যদানের অর্থ।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সকল ধর্মই আদেশ করে তওহীদের ধর্ম ও রসূলদের অনুসরণ করতে। আর শয়তান সেই 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম' অবলম্বন করতে আদম-সন্তানকে বাধা প্রদান করে। সে তো পূর্ব থেকেই এ কাজে সংকল্পবদ্ধ।

{قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ} (١٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, সে বলল, 'যাদের কারণে তুমি আমাকে ভ্রষ্ট করলে, আমিও তাদের জন্য তোমার সরল পথে নিশ্চয় ওঁৎ পেতে থাকব। *(সূরা আ'রাফ ১৬ আয়াত)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٦٠) وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ} (٦١) سورة يـــس

অর্থাৎ, হে আদম সন্তান-সন্ততিগণ! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং আমারই দাসত্ব কর। এটিই সরল পথ। *(সূরা ইয়াসীন ৬০-৬১ আয়াত)*

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক ও সঙ্গত প্রশ্ন মনে উদয় হতে পারে, নামাযী মুসলিম নামাযে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে কিভাবে হিদায়াত চাইবে, অথচ সে তো হিদায়াতপ্রাপ্ত?

এর উত্তর কয়েকটি দেওয়া যেতে পারে ঃ-

১। 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম'-এর জন্য পরিপূর্ণ হিদায়াত তখন লাভ হবে, যখন বান্দা সর্বদা সেই ইল্‌ম ও আমল কাজে লাগাবে, যা এই সময় করতে আদিষ্ট হয়েছে এবং যা করতে তাকে নিষেধ করা হয়েছে, তা বর্জন করবে। আর এর জন্য প্রয়োজন হল এই সময় যা করতে তাকে আদেশ ও নিষেধ করা হয়েছে, তা শিখবে ও আমল করবে। যে পর্যন্ত না তার মনে সৎকর্ম করার ও অসৎকর্ম বর্জন করার দৃঢ় সংকল্প হয়েছে। আর এই তফসীলী ইল্‌ম ও সংকল্প একই সময়ে অর্জিত হওয়ার কথা কল্পনাই করা যায় না। বরং সর্বদা সে এ কথার মুখাপেক্ষী থাকে যে, মহান আল্লাহ তার হৃদয়ে ইল্‌ম ও সংকল্প প্রক্ষিপ্ত করবেন, যার দ্বারা সে 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম'-এর হিদায়াত লাভ করবে। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ১৪/৩৭-৩৮)*

উদাহরণ স্বরূপ কোন মুসলিম দিনে একশ'টি ভাল কাজ করে, চাহে তা প্রকাশ্য কাজ হোক অথবা গুপ্ত। আর অনেক সৎকর্মাবলীর মধ্যে একটি

সৎকর্ম হল উপকারী জ্ঞান অনুসন্ধান করা। কেউ তার কম কাজ করতে পারে, কেউ তার বেশী করতে পারে। সুতরাং তারা যখন আল্লাহর কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করবে, তখন তারা আসলে তাঁর কাছে নিজ নিজ মর্যাদার পরিপূর্ণতা প্রার্থনা করবে।

বরং একটি সৎকর্মই, তা বহু লোকে করলেও, তারা নিজ নিজ হিদায়াতে বিভিন্ন হতে পারে। দু'জন লোক একই ইমামের পিছনে নামায পড়ে, পাশাপাশি (কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে) দাঁড়িয়ে নামায শেষ করে, অথচ দু'জনের নামাযের মাঝে আকাশ-পাতালের ব্যবধান হয়। অনুরূপ আল্লাহর প্রতি ভরসা, আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসা ও ঘৃণা করা, সাদকা, রোযা, হজ্জ, দাওয়াত, সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দানের কাজ, সচ্চরিত্রতা ইত্যাদি (সকল মানুষের সমান নয়)।

২। হিদায়াত একই পর্যায়ের নয়; বরং তার অনেক অনেক পর্যায় আছে। তাক্বওয়ার পরিপূর্ণতার সাথে হিদায়াত পরিপূর্ণতা লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (١٣) سورة الحجرات

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। *(সূরা হুজুরাত ১৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى} (٧٦) سورة مريم

অর্থাৎ, যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের পথপ্রাপ্তিতে বৃদ্ধি দান করেন। *(সূরা মারয়্যাম ৭৬ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ} (١٧) سورة محمد

অর্থাৎ, যারা সৎপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে চলার

শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে ধর্মভীরু হবার শক্তি দান করেন। *(সূরা মুহাম্মাদ ১৭ আয়াত)*

হুদাইবিয়্যার সন্ধির দিন মহান আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ ক'রে বলেছেন,

{وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا} (٢) سورة الفتح

অর্থাৎ, ... এবং তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন। *(সূরা ফাত্হ ২ আয়াত)*

উদ্দেশ্য অতিরিক্ত হিদায়াত।

যেমন দ্বীনের পর্যায় রয়েছে তিনটি; ইসলাম, তার থেকে উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে ঈমান, আর সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে ইহসান। আবার প্রত্যেক পর্যায়েরও বিভিন্ন পর্যায় আছে।

যেমন নেক লোকদের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, সর্বোচ্চ পর্যায়ের হলেন নবী, তাঁর নিম্নে সিদ্দীক্ব, তাঁর নিম্নে শহীদ এবং তাঁর নিম্নে স্বালেহ। আর প্রকাশ্য ও গুপ্ত ইল্‌ম ও আমল অনুসারে তাঁদের মাঝেও বিভিন্ন পর্যায় আছে।

৩। বান্দা আমরণ হিদায়াতে (সরল পথে) অবিচল ও প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায়। আল্লাহ সে অবিচলতা ও প্রতিষ্ঠা দান করেন। তিনি বলেন,

{يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ} (٢٧) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণী দ্বারা ইহজীবনে ও পরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং যারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্ত করেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। *(সূরা ইব্রাহীম ২৭ আয়াত)*

সুবিজ্ঞ লোকদের একটি দুআ হল,

{رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ} (٨) سورة آل عمران

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র ক'রে দিও না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান কর। নিশ্চয় তুমি মহাদাতা। *(সূরা আলে ইমরান ৮ আয়াত)*

সবচেয়ে বড় সুবিজ্ঞ হন আম্বিয়াগণ। আর তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর একটি দুআ ছিল,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلى دِيْنِكَ.

অর্থাৎ, হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। *(আহমাদ ৬/৯১, ৩০২, ৩১৫, তিরমিযী ৩৫২২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৯১নং)*

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلى طَاعَتِكَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হে হৃদয়সমূহকে আবর্তনকারী! তুমি আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর। *(মুসলিম ৬৭৫০নং)*

ভেবে দেখুন, কিভাবে নবী ﷺ এই দুআ পড়তেন, অথচ তিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের প্রেরিত রসূল, সারা সৃষ্টির সর্দার! আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, বরং তাঁকে মাক্বামে মাহমূদ (মহা সুপারিশ, জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান 'অসীলা'), হওয আর কওসারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর এ দুআ আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার করার জন্য ছিল। যেহেতু আল্লাহই তাঁকে হিদায়াত দান করেছিলেন। তিনি নিজে হিদায়াতের মালিক ছিলেন না। তাই তিনি দুআ করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁকে সেই হিদায়াতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন, সেই পরিপূর্ণ হিদায়াত হ্রাস না ক'রে তা পর্যায়ে বৃদ্ধি দান করেন।

কোন কোন উলামা বলেন, 'বান্দা যা করে ও ছাড়ে তাতে প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি নিঃশ্বাসে হিদায়াতের মুখাপেক্ষী। যেহেতু নিম্নের অবস্থাসমূহের

মধ্য হতে পৃথক হতে পারে না ঃ-

এমন কাজ সে অজান্তে হিদায়াত ছাড়া ক'রে ফেলেছে, যাতে সে হকের প্রতি হিদায়াত প্রার্থনা করার মুখাপেক্ষী হয়।

অথবা এমন কাজ সে ক'রে ফেলেছে, যাতে সে হিদায়াত (সঠিক পথ) জানত, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে সে সঠিকতার বিপরীত করেছে। এখন সে তওবার মুখাপেক্ষী।

অথবা এমন কাজ, যাতে সে ইল্ম ও আমলে হিদায়াত (সঠিক পদ্ধতি) জানে না। সুতরাং সে তা জানা ও শিক্ষার ব্যাপারে, তা ইচ্ছা করার ব্যাপারে এবং তা আমল করার ব্যাপারে হিদায়াতশূন্য থাকে।

অথবা এমন কাজ, যার কিছু অংশে সে হিদায়াত লাভ করে, আর কিছু অংশে লাভ করে না। সুতরাং সে তাতে পরিপূর্ণ হিদায়াতের মুখাপেক্ষী।

অথবা এমন কাজ, যার মৌলিক বিষয়ে সে হিদায়াত লাভ করেছে, কিন্তু তফসীল বিষয়ক হিদায়াত থেকে বঞ্চিত আছে। সুতরাং সে উক্ত তফসীল বিষয়ক হিদায়াতের মুখাপেক্ষী।

অথবা পথের হিদায়াত সে লাভ করে, কিন্তু পথের ভিতরকার সমস্যা নিয়ে অতিরিক্ত হিদায়াতের মুখাপেক্ষী হয়। যেহেতু পথের হিদায়াত লাভ করা এক জিনিস। আর পথের ভিতরকার সমস্যা নিয়ে প্রয়োজনীয় হিদায়াত অন্য জিনিস। ঐ দেখুন না, লোকটি অমুক শহরের রাস্তা এই এইভাবে যেতে হয়, তা চেনে। কিন্তু সে রাস্তায় সে ভালভাবে চলতে পারে না। কেননা, খোদ রাস্তা চলার জন্য খাস হিদায়াতের প্রয়োজন। যেমন অমুক সময়ে রাস্তা চলা ভাল, অমুক সময়ে ভাল নয়। অমুক বিপজ্জনক জায়গায় এত পরিমাণ পানি রাখা দরকার। অমুক জায়গায় হল্ট্ করা ভাল, অমুক জায়গায় ভাল নয়। এই সকল হিদায়াত অনেক ক্ষেত্রে পথ-চেনা লোকেও অবহেলা করে, ফলে সে ধ্বংসমুখে পতিত হয় এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হয় না।

অনুরূপভাবে এমন কিছু বিষয়ও আছে, যাতে ভবিষ্যতে হিদায়াতের দরকার, যেমন অতীতে হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল।

এমন কিছু বিষয় আছে, যাতে তার হক বা বাতিল কোন বিশ্বাস নেই। সে ক্ষেত্রে সে সঠিক বিশ্বাসের জন্য হিদায়াতের মুখাপেক্ষী।

এমন বিষয় আছে, হয়তো সে মনে করে যে, তাতে সে হিদায়াতের উপর আছে। অথচ সে আছে ভ্রষ্টতার উপরে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে সে সেই ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াতের মুখাপেক্ষী।

এমন কর্ম আছে, যা সে হিদায়াত লাভ করেই করেছে। এখন তার প্রয়োজন হল, অপরকে সেই কর্মের দিকে হিদায়াত করা, তাকে সে পথ প্রদর্শন করা ও উপদেশ দেওয়া। যেহেতু এতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে যথেষ্ট হিদায়াত তার হাতছাড়া হবে। যেমন অপরকে হিদায়াত করা, শিক্ষা দেওয়া এবং উপদেশ দেওয়া নিজের জন্য হিদায়াতের দরজা খুলে দেয়। কারণ, বিনিময় সমশ্রেণীর কর্ম থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং যখনই সে অপরকে হিদায়াত করবে ও শিক্ষা দেবে, তখনই আল্লাহ তাকে হিদায়াত করবেন ও জ্ঞানদান করবেন। যেমন নবী ﷺ দুআয় বলতেন,

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ، غَيْرَ ضَالِّينَ وَلا مُضِلِّينَ، حَرْبًا لأَعْدَائِكَ، وَسِــــلْمًا لأَوْلِيَائِكَ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ النَّاسَ، وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে হিদায়াতকারী হিদায়াতপ্রাপ্ত বানাও, ভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টকারী বানায়ো না। তোমার দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী এবং তোমার দোস্তদের সাথে শান্তি স্থাপনকারী বানাও। তোমার ভালবাসায় আমরা লোককে ভালবাসব এবং তোমার শত্রুতায় তোমার বিরোধীদের সাথে শত্রুতা রাখব। *(রিসালাতু ইবনিল ক্বাইয়েম ইলা আহাদি ইখওয়ানিহ, তাহক্বীক্ব আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-মুদাইফির, হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী, ইবনে খুযাইমা ১১১৯, ইবনে আসাকির, আহমাদ ৪/২৬৪, ইবনে আবী শাইবাহ ৪৪২নং, বাইহাকী, দাওয়াত কাবীর ২২০নং, হাকেম ১৯২৩নং, ইবনে হিব্বান ১৯৭১নং, নাসাঈ ১৩০৫, ১৩০৬নং প্রমুখ, মুসনাদের মুহাক্কিক হাদীসটিকে বিভিন্ন সূত্রের সমষ্টির ভিত্তিতে সহীহ বলেছেন। আলবানী যয়ীফ বলেছেন। অবশ্য*

দুআটির প্রথম অংশটি সহীহ।)

মোটকথা আপনি যখন হিদায়াত চেয়ে দুআ করেন, তখন দু'টি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস অর্জন করতে আগ্রহী হওয়া উচিত ঃ-

প্রথম হল উপকারী ইল্‌ম, তা আপোসে আলোচনা করা, মুখস্থ করা এবং বেশী বেশী জ্ঞান অনুসন্ধান করা। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا} (١١٤) سورة طــه

অর্থাৎ, বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।' *(সূরা ত্বাহা ১১৪ আয়াত)*

দ্বিতীয় হল উপকারী ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করা, তা বৃদ্ধি করা এবং তাতে অবিচল থাকা।

۞ একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব

'না'বুদ, নাস্তাঈন ও ইহদিনা' ক্রিয়াগুলিতে বহুবচনের পদ (আমরা) ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ দুআকারী কখনো একাকী হতে পারে। তা কেন?

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিধেয় দুআর সাথে কাকুতি-মিনতি জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন,

{ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (٥٥) سورة الأعراف

অর্থাৎ, তোমরা কাকুতি-মিনতি সহকারে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। *(সূরা আ'রাফ ৫৫ আয়াত)*

আর কাকুতি-মিনতি আহবান করে দুর্বলতা ও লাঞ্ছনা প্রকাশ করাকে। অথচ হিদায়াত প্রার্থনায় এখানে বহুবচনের পদ এসেছে!

এর একাধিক জবাব রয়েছে ঃ-

দুআকারী নিজেকে সামগ্রিকভাবে নেক বান্দাদের দলে শামিল করে এবং নিজেকে তাদের মধ্য হতে (একবচন পদ ব্যবহার ক'রে) নিজেকে

প্রকাশ করে না। আর এমনটি মনের অহমিকা ও অহংকার দূর করার জন্য সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি।[২৭]

বহুবচন পদ এখানে মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ গুণকীর্তন করতে সহযোগী। এ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর বান্দা ও দাস অনেক। বহু সৃষ্টি তাদের প্রতিপালকের নিকট হিদায়াত চায়, সাহায্য চায়। আল-কুরআনের আম দুআগুলি এর অনুরূপ। যেমন সূরা বাক্বারার শেষ আয়াত, সূরা আলে ইমরানের প্রথম ও শেষ দিকে এবং আরো অনেক জায়গায় এই শ্রেণীর দুআ মজুদ রয়েছে। *(বাদাইউত তাফসীর ১/২৫৫)*

মু'মিন বান্দা নিজের জন্য প্রার্থনা করে এবং তার মু'মিন ভাইদের জন্যও প্রার্থনা করে। আর এতে রয়েছে আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)দের অনুকরণ। নূহ ﷺ দুআ ক'রে বলেছিলেন,

{رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা বিশ্বাসী হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করেছে তাদেরকে এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে।' *(সূরা নূহ ২৮ আয়াত)*

ইব্রাহীম ﷺ দুআয় বলেছিলেন,

{رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ} (٤١) سورة إبراهيم

[২৭] মুফাস্‌সির আলূসী কোন কোন উলামা থেকে নকল করেছেন যে, ইসমাঈল ﷺ বলেছিলেন, {سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} (١٠٢) سورة الصافات অর্থাৎ, ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।' *(সূরা স্বাফ্‌ফাত ১০২ আয়াত)* এবং তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন। পক্ষান্তরে মূসা ﷺও বলেছিলেন, {سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِرًا} (٦٩) سورة الكهف অর্থাৎ, 'ইন শাআল্লাহ (আল্লাহ চাইলে) আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।' *(সূরা কাহফ ৬৯ আয়াত)* কিন্তু তিনি ধৈর্য ধরতে পারেননি; অথচ উভয়েই 'ইন শাআল্লাহ' বলেছিলেন। রহস্য এই যে, ইসমাঈল ﷺ নিজেকে ধৈর্যশীল জামাআতে শামিল করেছিলেন। আর মূসা ﷺ তা করেননি। *(দেখুনঃ রূহুল মাআনী ১/১৪৬)*

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং বিশ্বাসীদেরকে ক্ষমা করো।' *(সূরা ইব্রাহীম ৪১ আয়াত)*

আর মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে বলেছিলেন,

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই। আর ক্ষমা-প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। *(সূরা মুহাম্মাদ ১৯ আয়াত)*

বহুবচন শব্দের দুআতে রয়েছে দুআকারীর মুসলিম ভাইদের প্রতি সযত্নতা। মুসলিম মানুষের জন্য মঙ্গল পছন্দ করে। (মুসলিম স্বার্থপর হয় না, পরার্থপর হয়।) তাই দুআতে সে তাদেরকে ভুলে না গিয়ে নিজের জন্য তথা তাদের জন্যও দুআ করে।

তাছাড়া সূরা ফাতিহা (ইমাম মুক্তাদী সকলের জন্য) নামাযে পড়া ওয়াজেব। আর ফরয নামায জামাআত সহকারে বিধিবদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে তিন ওয়াক্তের নামায সশব্দে পড়া হয়। ইমাম (সূরা ফাতিহা পড়ে) দুআ করেন, আর মুক্তাদীরা সকলে নিজেদের জন্য এবং ব্যাপকভাবে সকল মুসলিম ভাইদের জন্য 'আমীন' (কবুল কর) বলে। যদি তারা ইমামের একবচন দুআয় 'আমীন' বলত, তাহলে তাদের সকলের দুআ কেবল ইমামের জন্য হত।

ষষ্ঠ আয়াত

[صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ]

অর্থাৎ, তাদের পথ---যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ।

বান্দার দুআ এখনো শেষ হয়নি। বরং 'ইহদিনাস স্বিরাত্বাল মুস্তাক্বীম' বলার পর থেকে শেষ সূরা পর্যন্ত উক্ত দুআর ব্যাখ্যা ও স্বতন্ত্রতা রক্ষাকারী বাক্য। এতে রয়েছে প্রার্থিত ও বাঞ্ছিত পথের বিবরণে আগ্রহ এবং ঘৃণিত ও অবাঞ্ছিত পথ সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ।

সুতরাং যখন বলা হল যে, পথটি সরল। তখন তা আরো স্পষ্ট করা হল এবং তাদের বিবরণ দেওয়া হল, যারা সে পথে চলে, সে পথ অবলম্বন করে এবং পরিবর্তন করে না, রদবদল করে না। অতএব সে পথ পথিকশূন্য নয়; যাতে কোন পথিক একা চলতে শঙ্কাবোধ করবে। বরং সে পথ চালু পথ, পথিকে পরিপূর্ণ পথ। সে পথের পথিকগণ হলেন সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি।

হ্যাঁ! সচেতন দুআকারী যেসব বিষয়ে সযত্ন হবে, তার মধ্যে একটি এই যে, সে তার দুআকে বিশেষ গুণ দ্বারা বিশিষ্ট ক'রে নেবে এবং যে জিনিস পছন্দ করে না, সে জিনিস হতে নিজের দুআকে পৃথক ক'রে নেবে। আর এটা হবে তার প্রার্থনার প্রতি সযত্নতার দলীল।

বলা বাহুল্য সূরা ফাতিহা পাঠকারিগণ নিজেদের দুআ ও প্রার্থনাকে উক্ত স্পষ্ট ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্ট ক'রে নেন। যেহেতু পথিকের নিকট পথ গোলমাল হতে পারে। কেননা, পথ অনেক এবং পরস্পর সুসদৃশ। তাই তারা তাদের বাঞ্ছিত পথের বিবরণ দিয়ে বলে যে, তারা সেই পথ পেতে চায়, যে পথের পথিকদেরকে আল্লাহ বিশেষ নিয়ামত দানে ধন্য করেছেন। সেই ব্যাপক নিয়ামত তাঁদেরকে দান করেছেন, যার মাধ্যমে

সুখী জীবন এবং স্থায়ী সাফল্য লাভ হয়। সাধারণ সেই নিয়ামত নয়, যার মাধ্যমে তা লাভ হয় না।

۞ নিয়ামতপ্রাপ্ত কারা?

মহান আল্লাহ সে বিবরণ দিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা একাধিক শ্রেণীর। তিনি বলেছেন,

{وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (٦٩) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيمًا} (٧٠) سورة النساء

অর্থাৎ, যে কেউ আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য করবে, (শেষ বিচারের দিন) সে তাদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক (নবীর সহচর), শহীদ ও সৎকর্মশীলগণ। আর সঙ্গী হিসাবে এরা অতি উত্তম। এ হল আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ। বস্তুতঃ মহাজ্ঞানী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। *(সূরা নিসা ৬৯-৭০ আয়াত)*

এ হল দুআকারীর চাহিদা যে, সে সৃষ্টির সেরা মানুষ শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎদের অনুরূপ হবে। (তাঁদের দলভুক্ত হবে।) নিয়ামতপ্রাপ্ত ও সরল পথের পথিকগণ হলেন তাঁরা, যাঁরা আল্লাহর আনুগত্য করেন, তাঁর রসূল ﷺ-এর আনুগত্য করেন। আর এই বিবরণে প্রত্যেক তওহীদবাদী ভারপ্রাপ্ত মুসলিম---সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত---সকলেই শামিল হবে।

এই নিয়ামত আল্লাহর তরফ থেকে অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা অনুগৃহীত করেন, তিনি সর্বজ্ঞ হিকমত-ওয়ালা। সুতরাং দুআকারী সরল পথের পথিকদের সংখ্যা নগণ্য দেখে যেন অবশ্যই দুঃখিত ও মনঃক্ষুণ্ণ না হয়; যেহেতু তারাই নিয়ামতপ্রাপ্ত। আর সত্যিই তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য। দুআকারী যেন অবশ্যই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়, যদি তার শত্রুদের সংখ্যাধিক্য দেখে। তারা সংখ্যায় অধিক হলেও, মর্যাদায়

নেহাতই কম। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّـنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} (١١٦) سورة الأنعام

অর্থাৎ, যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত ক'রে দেবে। তারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে এবং তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথাবার্তাই বলে থাকে। *(সূরা আনআম ১১৬ আয়াত)*

পথের বিবরণে তাকে 'সরল' বলা হয়েছে এবং অন্য আয়াতে সে পথের পথিকদের বিবরণে বলা হয়েছে, তাঁরা হলেন আম্বিয়া, সিদ্দীক, শহীদ ও স্বালেহীনগণ। প্রমাণ হল যে, 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম' পরোক্ষ জিনিস, প্রত্যক্ষ নয়। যে পথে নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ উপকারী ইল্ম ও নেক আমল সম্বল ক'রে দুনিয়ায় চলে থাকেন। যে পথ তাঁদেরকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি তথা তাঁর জান্নাতে পৌঁছে দেয়।

আভিধানিক অর্থে 'নিয়ামত' বলা হয় ভাল অবস্থাকে। যে অবস্থায় মানুষ সচ্ছল থাকে, জীবন মনঃপূত থাকে, যাতে সুখ পাওয়া যায়। *(মাক্বাইসুল লুগাহ, ইবনে ফারেস ৫/৪৪৬)*

আর 'ইনআম' (নিয়ামত দান করা) মানে হল, জ্ঞানীদের প্রতি অনুগ্রহ পৌঁছে দেওয়া। *(মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআন, রাগেব আসফাহানী৮ ১৫পৃঃ)*

মহান আল্লাহ যে সকল নিয়ামত বান্দাকে দান ক'রে থাকেন, তার মধ্যে বিনা শর্তে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হল, সরল পথের প্রতি হিদায়াত। সে নিয়ামত খাদ্য, পানীয় ও লেবাস-পোশাক থেকেও বড়। বরং তা বৈষয়িক সকল বস্তু থেকে উত্তম। যেহেতু তাতে আছে ইহলৌকিক বাস্তবিক নিয়ামত এবং পারলৌকিক চিরস্থায়ী নিয়ামত।

নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝেও বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর আছে---যেমন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের হলেন নবীগণ। আবার

তাঁদের মাঝেও পর্যায়ক্রম আছে। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁরা সকলেই সরল পথের পথিক।

অতঃপর সিদ্দীকগণ। আর তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলেন, আবূ বাক্র رضي الله عنه। তাঁরা সকলেই সরল পথের পথিক।

অতঃপর শহীদগণ। আর তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন হামযা رضي الله عنه। এবং সেই ব্যক্তি যে কোন যালেম বাদশার কাছে গিয়ে সৎকর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দ কর্ম থেকে নিষেধ করে, অতঃপর সে তাকে হত্যা করে। এবং সেই মু'মিন, যাকে দাজ্জাল হত্যা করবে।[২৮] তাঁরা

---

(২৮) আবূ সাঈদ খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, দাজ্জালের আবির্ভাব হলে মু'মিনদের মধ্য থেকে একজন মু'মিন তার দিকে অগ্রসর হবে। তখন (পথিমধ্যে) দাজ্জালের সশস্ত্র প্রহরীদের সাথে তার দেখা হবে। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, কোন্ দিকে যাবার ইচ্ছা করছ? সে উত্তরে বলবে, যে ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে তার কাছে যেতে চাচ্ছি। তারা তাকে বলবে, তুমি কি আমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর না? সে উত্তর দেবে, আমাদের প্রভু (আল্লাহ তো) গুপ্ত নন যে, (অন্য কাউকে প্রভু বানিয়ে মানতে লাগব)। (এরূপ শুনে) তারা বলবে, একে হত্যা করে দাও। তখন তারা নিজেদের মধ্যে একে অপরকে বলবে, তোমাদের প্রভু কি তোমাদেরকে নিষেধ করেননি যে, তোমরা তার বিনা অনুমতিতে কাউকে হত্যা করবে না? ফলে তারা ঐ মু'মিনকে ধরে নিয়ে দাজ্জালের কাছে যাবে। যখন মু'মিন দাজ্জালকে দেখতে পাবে, তখন সে (স্বতঃস্ফূর্তভাবে) বলে উঠবে, হে লোক সকল! এই সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে আল্লাহর রসূল ﷺ আলোচনা করতেন। তখন দাজ্জাল তার জন্য আদেশ দেবে যে, ওকে উপুড় করে শোয়ানো হোক। তারপর বলবে, ওকে ধরে ওর মুখে-মাথায় প্রচন্ডভাবে আঘাত কর। সুতরাং তাকে মেরে মেরে তার পেট ও পিঠ চওড়া করে দেওয়া হবে। তখন সে (দাজ্জাল) প্রশ্ন করবে, তুমি আমার প্রতি বিশ্বাস রাখ? সে উত্তর দেবে, তুই তো মহা মিথ্যাবাদী মসীহ। সুতরাং তার সম্পর্কে আবার আদেশ দেওয়া হবে, ফলে তার মাথার সিথির উপর করাত রেখে তাকে দ্বিখন্ড ক'রে দেওয়া হবে; এমনকি তার পা-দুটোকে আলাদা ক'রে দেওয়া হবে। তারপর দাজ্জাল তার দেহখন্ডদ্বয়ের মাঝখানে হাঁটতে থাকবে এবং বলবে উঠ, সুতরাং সে (মু'মিন) উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে! দাজ্জাল আবার তাকে প্রশ্ন করবে, তুমি কি আমার প্রতি ঈমান আনছ? সে জবাব দেবে, তোর সম্পর্কে তো আমার ধারণা আরোও দৃঢ় হয়ে গেল। তারপর মু'মিন বলবে, হে লোক সকল! আমার পর ও অন্য কারো সাথে এরূপ (নির্মম) আচরণ করতে পারবে না। সুতরাং দাজ্জাল তাকে যবেহ করার মানসে ধরবে। কিন্তু আল্লাহ তার ঘাড় থেকে কণ্ঠাস্থি পর্যন্ত তামায় পরিণত ক'রে দেবেন। ফলে দাজ্জাল তাকে যবেহ করার কোন উপায় খুঁজে পাবে না। তারপর তার হাত-পা ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তখন লোকে ধারণা করবে যে,

সকলেই সরল পথের পথিক।

অতঃপর স্বালেহীন (নেক লোক)গণ। আর তাঁদের রয়েছে অনেক পর্যায়। তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের লোক হলেন তাঁরা, যাঁরা বিনা হিসাবে জান্নাত প্রবেশ করবেন। তাঁরা সকলেই সরল পথের পথিক।

লোককে (পূর্ণ অথবা অপূর্ণ) 'নেক লোক' তখন বলা হবে, যখন কেউ ইসলামে প্রবিষ্ট হয়ে তার শরীয়ত অনুযায়ী আমল করবে। আর 'নেক লোক'-এর সংজ্ঞা থেকে সে দূরে সরে যাবে, যখন ওয়াজেব আদায়ে অবহেলা করবে অথবা মহাপাপ ও নিষিদ্ধ বস্তু বর্জন করার ব্যাপারে শৈথিল্য করবে। অবশ্য সে ইসলাম-বিধ্বংসী কোন কর্মে লিপ্ত হবে না এবং এই অবস্থায় তার মৃত্যু হবে। মহান আল্লাহ তাকে হয়তো ক্ষমা ক'রে দেবেন এবং শাস্তি দেবেন না। নতুবা তার পাপ অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেবেন। অতঃপর সে তওবাদী হওয়ার কারণে তাকে বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার দান করবেন।

ভারপ্রাপ্ত (মুসলিম)রা নিজ নিজ আমল নিয়ে পৃথক পৃথক বহু পথে চলে থাকে। অথচ মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, আমরা তাঁর নিকট সঠিক পথ লাভের তওফীক প্রার্থনা করব, যে পথ তাঁর নিকট পৌঁছে দেয়। আর এর মাধ্যমে তাঁর সেই আদেশ পালনে প্রয়াসী হব, যাতে তিনি বলেন,

{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ} (١٥٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ কর

সে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করল। কিন্তু (বাস্তবে) তাকে জান্নাতে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বিশ্বচরাচরের পালন কর্তার নিকট ঐ ব্যক্তিই সবার চেয়ে বড় শহীদ। *(মুসলিম ২৯৩৮নং)*

এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে। *(সূরা আনআম ১৫৩ আয়াত)*

۞ দুনিয়ার স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম ও দোযখের উপর স্থাপিত পুল-স্বিরাত্বের মাঝে সম্পর্ক

প্রিয় পাঠক! জেনে রাখুন যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপর স্থাপিত প্রত্যক্ষ পথ (পুল)এ চলার সময় পরিত্রাণের ব্যাপারে পার্থিব জীবনের এই পরোক্ষ পথে চলার বড় প্রভাব রয়েছে। সে পুলের ভয়ানক বিবরণ এই যে, তা হবে পিছল, তাতে থাকবে আঁকড়া ও আঁকুশি, আর থাকবে লোহার চওড়া ও বাঁকা কাঁটা, যা নজদের সা'দান কাঁটার মত। *(বুখারী ৭৪৩৯, মুসলিম ৪৫৪নং)*

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, 'আমার কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, সে (পুল) হবে চুল থেকেও অধিক সূক্ষ্ম এবং তলোয়ার থেকেও অধিক ধারালো।'[২৯] *(মুসলিম, মওকূফ হাদীস মরফূ'র মানে ৪৫৫নং)*

ইবনে রজব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, (পুল-স্বিরাত্বের উপর) আলোর ভাগাভাগি অতিক্রমকারীদের ঈমান ও নেক আমল অনুসারে হবে। অনুরূপ সিরাতের উপর তাদের দ্রুত ও ধীর গতির চলনও। যেহেতু ঈমান ও নেক আমলই এ দুনিয়ার 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম', যার উপর চলতে এবং অবিচল থাকতে মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে আদেশ করেছেন। তা লাভ করার জন্য হিদায়াত প্রার্থনা করতে আদেশ করেছেন। সুতরাং এই

[২৯] উলামাদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, পুল-সিরাত চওড়া না সূক্ষ্ম? কেউ কেউ বলেছেন, পুল-সিরাত চওড়া, কারণ তা পিচ্ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, তা সূক্ষ্ম। যেহেতু আবূ সাঈদ সে কথাই বলেছেন। শায়খ ইবনে উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) এ ব্যাপারে দু'টি মতের মধ্যে কোনটিকেও নিশ্চিত বলে ব্যক্ত করেননি। কারণ প্রত্যেকের কাছেই শক্ত দলীল রয়েছে। আর আল্লাহই অধিক জানেন। *(দেখুন ঃ শারহুল আক্বীদাতিল ওয়াসিত্বিয়্যাহ ২/১৬০)*

'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম'-এর উপর যার চলন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিকভাবে সরল হবে, জাহান্নামের উপর স্থাপিত ঐ পুল-স্বিরাত্বের উপরেও তার চলন সরল হবে। পক্ষান্তরে এই দুনিয়ার 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম'-এর উপর যার চলন সরল হবে না; বরং সন্দিহানের ফিতনার দিকে বাঁকা হবে অথবা প্রবৃত্তির ফিতনার দিকে টেরা হবে, স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীমে তার সন্দিহান ও প্রবৃত্তির টেনে নেওয়ার পরিমাণ অনুযায়ী জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলস্বিরাত্বের আঁকড়াও তাকে টেনে টেনে নামাবে। যেমন আবূ হুরাইরার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "(সেসব আঁকড়া) মানুষের আমল অনুসারে টেনে টেনে নামাবে।" *(বুখারী ৮০৬, মুসলিম ৪৫১নং)*

সুতরাং আপনি যদি জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুল-স্বিরাত্ব বেয়ে পার হতে নিরাপত্তা চান, হে জ্ঞানী ও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ! আপনি যদি পরিত্রাণে অগ্রণী হতে চান, তাহলে আপনি আল্লাহর সেই স্বিরাত্বে চলুন, যার উপর দুনিয়ায় চলতে তিনি আপনাকে আদেশ করেছেন। আপনি খাঁটিভাবে কেবল আল্লাহর ইবাদত ক'রে এবং একমাত্র রসূল ﷺ-এর আনুগত্য ক'রে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্য বাস্তবায়ন করুন।

নবীগণকে ভালবাসুন, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি ঈমান রাখুন, তাঁদের মাঝে কোন পার্থক্য রাখবেন না। সিদ্দীক্বীনকে ভালবাসুন, সেই শহীদগণকে ভালবাসুন, যাঁরা এই দ্বীনকে উচ্চ করার জন্য শহীদ হয়েছেন। নেক লোকদেরকে ভালবাসুন, সত্যিকার ভালবাসা, কেবল মৌখিক দাবীর ভালবাসা নয়। আর সত্যিকার ভালবাসা প্রমাণ হবে তখন, যখন আপনি তাঁদের সাদৃশ্য ও আনুরূপ্য অবলম্বন করবেন এবং অনুসরণ করবেন। আর জেনে রাখুন যে, (নবী ﷺ বলেছেন,) "(কিয়ামতে) মানুষ তার সাথে অবস্থান করবে, যাকে সে ভালবাসে।" *(মুসলিম ৬৭১৮নং)*

সপ্তম আয়াত

[غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ]

অর্থাৎ, তাদের পথ---যারা ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী) নয় এবং যারা পথভ্রষ্টও (খ্রিষ্টান) নয়।

মহান আল্লাহর শিখানো মত বান্দা তার প্রার্থনায় প্রার্থিত পথের অধিক বিবরণ দিচ্ছে। সে চাচ্ছে যে, আল্লাহ যেন তাকে তাদের পথ হতে দূরে রাখেন, যারা 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম'-এর প্রতি হিদায়াত স্বরূপ নিয়ামতপ্রাপ্ত ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তারা তাতে অবিচল না থেকে পথচ্যুত হয়। ফলে তারা আমলী ইচ্ছাশক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তারা আল্লাহর ক্রোধভাজন হয়; যেমন হয়েছে ইয়াহুদীরা। অথবা তারা তাত্ত্বিক ইলমীশক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তারা পথভ্রষ্ট হয়; যেমন হয়েছে খ্রিষ্টানরা। *(এই দুই শক্তির কথা ৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

এ দুআ করার সাথে সাথে বান্দার নিজস্ব চেষ্টারও প্রয়োজন আছে; যাতে সে সেই জিনিস থেকে নিরাপদ থাকতে পারে, যে জিনিসে উক্ত দু'টি দল পতিত হয়েছে। সুতরাং সে তাদের পথ থেকে সাবধান থাকবে। যেহেতু হাদীসে এসেছে, নবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত-বিঘত এবং হাত-হাত (সম) পরিমাণ। এমনকি তারা যদি গো-সাপের (সান্ডা)র গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও তাদের পিছনে পিছনে যাবে। (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর প্রকাশ্যে সঙ্গম করে, তাহলে তোমরাও তা করবে!)" সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ইয়াহুদ ও নাসারার অনুকরণ করার কথা বলছেন?' তিনি বললেন, "তবে আবার কার?" *(বুখারী ৩৪৫৬, মুসলিম ৬৭৮১নং)*

'গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম'-এর মানে হল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্রোধভাজন ব্যক্তিদের পথ থেকে দূরে রাখ।

۞ ক্রোধভাজন জাতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

যে জাতির উপর গযব ও ক্রোধ নাযিল হয়েছে স্পষ্টতঃ তারা ইয়াহুদ। ঈসা ﷺ-এর নবী হয়ে আসার পূর্বে তারা পরিবর্তন সাধন করেছিল। তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন মহান আল্লাহ। যেমন তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

{قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيلِ} (٦٠) سورة المائدة

অর্থাৎ, বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এ অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেব, যা আল্লাহর নিকট আছে? যাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকর বানিয়েছেন এবং যারা তাগূত (গায়রুল্লাহ)র উপাসনা করে, মর্যাদায় তারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত।' *(সূরা মাইদাহ ৬০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بَغْياً أَن يُنَزِّلُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ } (٩٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে; তা এই যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তারা অবিশ্বাস করছে শুধু এই হঠকারিতার দরুন যে, আল্লাহ তাঁর দাসদের মধ্য হতে

যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হল। আর (কাফের) অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। *(সূরা বাক্বারাহ ৯০ আয়াত)*

তারা বারবার ক্রোধভাজন হয়েছে তাদের আমল অনুসারে। অথবা তাদের উপর গযবের উপর গযব ঘনীভূত ও স্তূপীকৃত হয়েছে। *(বাদাইউত তাফসীর ১/২৪৪-২৪৫)*

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

{تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ} (٨٠) سورة المائدة

অর্থাৎ, তাদের অনেককে তুমি অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। তাদের কৃতকর্ম কত নিকৃষ্ট, যে কারণে আল্লাহ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন! আর তারা চিরকাল শাস্তিভোগ করবে। *(সূরা মাইদাহ ৮০ আয়াত)*

অবশ্য এ ব্যাপারে স্পষ্ট হাদীসও এসেছে, নবী ﷺ বলেছেন, "ইয়াহুদীরা হল ক্রোধভাজন এবং খ্রিষ্টানরা হল পথভ্রষ্ট।" *(আহমাদ, ৪/৩৭৮, ত্বায়ালিসী ১/১৪০, ত্বাবারানীর কাবীর ১৭/৯৮, হাদীসটিকে ইবনে হাজার ফাতহুল বারী ৮/ ১৫৯তে হাসান বলেছেন, আহমাদ শাকের তফসীর ত্বাবারীর তাহক্বীক্বে ১/ ১৮৬ তে এবং আলবানী সহীহুল জামে' ১৩৬৩পৃষ্ঠায় সহীহ বলেছেন।)*

আর এ তফসীরের ব্যাপারে সমস্ত মুফাস্‌সিরগণ একমত। *(আল-ইজমা' ফিত্‌-তাফসীর, শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আল-খুযাইরী ১৩৭- ১৪১পৃঃ)*

কিন্তু স্পষ্টভাবে কর্তার কথা উল্লেখ না ক'রে কর্তৃকারকের কথা উহ্য রেখে ('যাদের প্রতি তুমি ক্রোধান্বিত হয়েছ' না বলে 'যারা ক্রোধভাজন হয়েছে') কেন বলা হল? এর দু'টি কারণ আছে ঃ-

এক ঃ এতে রয়েছে সম্বোধনে পরিপূর্ণ আদব। যদিও সে কথা অন্য জায়গায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে। যেমন,

{مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ} (٦٠) سورة المائدة

অর্থাৎ, যাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত। *(সূরা মাইদাহ ৬০ আয়াত, এই শ্রেণীর কিছু নমুনা দেখুন ৯নং টীকায়)*

দুই ঃ গযব বা ক্রোধ কেবল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই নয়। বরং তাঁর বন্ধুরাও; যেমন ফিরিশ্‌তা, রসূল ও নেক লোকগণও ক্রোধান্বিত হন। তাঁরা তাঁদের মহান প্রতিপালকের ক্রোধে ক্রোধান্বিত হন; যেমন তাঁরা তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হন। *(বাদাইউত তাফসীর ১/২৩৫)*

আল্লাহর ক্রোধ? হ্যাঁ, মুসলিমের উচিত, মহান আল্লাহর সেই সকল গুণে বিশ্বাস রাখা, যে সকল গুণে তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন। সে গুণকে অর্থবিহীন মনে করা যাবে না, তাতে কোনরূপ পরিবর্তন বা বিকৃতি সাধন করা যাবে না, তার কোন দৃষ্টান্ত বা সদৃশ বর্ণনা করা যাবে না। তিনি তাই, যার কথা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলেছেন,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। আর তারপরেই বলেছেন,

{وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা শূরা ১১ আয়াত)*

'অলায-য্বা-ল্লীন'-এর অর্থ হল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পথভ্রষ্টদের পথ থেকে দূরে রাখ। আর পথভ্রষ্ট হল সেই ব্যক্তি যে ভুলবশতঃ এমন পথে চলে, যা বাঞ্ছিত নয়। সে হল গুমরাহ, পথহারা।

۞ পথভ্রষ্ট জাতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

এখানে যে জাতিকে পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে, তারা স্পষ্টতঃ খ্রিষ্টান জাতি। মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবী হয়ে আসার পূর্বে তারা পরিবর্তন সাধন করেছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ} (٧٧) سورة المائدة

অর্থাৎ, বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।' *(সূরা মাইদাহ ৭৭ আয়াত)*

খ্রিষ্টানদের মাসীহ ﷵ-কে উপাস্য বানানো তথা ত্রিত্ববাদের আকীদা বর্ণনার পর উক্ত আয়াত অনুক্রমে এসেছে। (আর তার মানেই পথভ্রষ্ট হল খ্রিষ্টানরা।)

অবশ্য এ ব্যাপারে স্পষ্ট হাদীসও এসেছে, নবী ﷺ বলেছেন, "ইয়াহুদীরা হল ক্রোধভাজন এবং খ্রিষ্টানরা হল পথভ্রষ্ট।" *(হাদীসটির হাওয়ালা ৯৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

আর এ তফসীরের ব্যাপারে সমস্ত মুফাস্‌সিরগণ একমত। *(হাওয়ালা ৯৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

অবশ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ইয়াহুদীরা ক্রোধভাজন; তারা পথভ্রষ্ট নয়। অথবা খ্রিষ্টানরা পথভ্রষ্ট; তারা ক্রোধভাজন নয়। বরং এখানে মহান আল্লাহ উভয় জাতির প্রসিদ্ধতর গুণ বর্ণনা ক'রে তাদের পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া প্রকৃতপক্ষে উভয় জাতিই ক্রোধভাজন ও পথভ্রষ্ট। *(তফসীর ইবনে কাসীর ১/২৮)*

۞ ইয়াহুদীদের ক্রোধভাজন এবং খ্রিষ্টানদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ

মহান আল্লাহ ইয়াহুদীদের উপর ক্রোধান্বিত এই জন্য যে, তারা হক জানার পরেও অহংকারবশতঃ, হিংসাবশতঃ, স্বার্থপরতাবশতঃ এবং নেতৃত্বের লালসাবশতঃ তা অস্বীকার করেছে।

তাদের অন্যতম 'হক' অস্বীকার হল, শেষনবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে অস্বীকার করা, অথচ তারা তাঁকে নবীরূপে চিনত; যেমন তারা নিজেদের সন্তানদেরকে চিনত। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ} (٨٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, তাদের নিকট যা আছে আল্লাহর নিকট হতে তার সমর্থক কিতাব এল; যদিও পূর্বে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তারা এর (এই কিতাব সহ নবীর) সাহায্যে বিজয় কামনা করত, তবুও তারা যা জ্ঞাত ছিল তা (সেই কিতাব নিয়ে নবী) যখন তাদের নিকট এল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। সুতরাং অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ হোক। *(সূরা বাক্বারাহ ৮৯ আয়াত)*

আর এর পূর্বে তারা বাছুর পূজা করেছে, উযাইরের পূজা করেছে, বহু নবীকে হত্যা করেছে, বহু স্পষ্ট নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে।

বলা বাহুল্য, ইয়াহুদীদের নিকট ইল্‌ম ছিল; কিন্তু আমল ছিল না। আর যে ব্যক্তি আলেম হয়, অথচ সে ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে না, (বরং জ্ঞানপাপী হয়) সে ক্রোধভাজন হয়।

পক্ষান্তরে খ্রিষ্টানদেরকে পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হতে পারে। যেহেতু তারা ঈসা ﷺ-এর অনুসারী। অতএব তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলা যায় কিভাবে?

এখানে তাদের পথভ্রষ্টতার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, ঈসা ﷺ তাওরাতকে সত্যজ্ঞান করতেন, আল্লাহ তাঁকে ইঞ্জীল দান করেছিলেন, তাতে সহজতা ছিল, অল্প কিছু অতিরিক্ত বিধান ছিল। আর এমন অনেক জিনিস ছিল, যা ইঞ্জীলে উল্লেখ ছিল না। সে সবের উৎস হল তাওরাত। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ}

অর্থাৎ, (আমি এসেছি) আমার পূর্বে (অবতীর্ণ) তওরাতের

সত্যায়নকারীরূপে ও তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল, তার কতকগুলিকে বৈধ করতে। *(সূরা আলে ইমরান ৫০ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (٤٦) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ} (٤٧) سورة المائدة

অর্থাৎ, আমি তাদের (নবীগণের) পরে পরেই মারয়্যাম-তনয় ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থকরূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং সাবধানীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাকে ইঞ্জীল (ঐশীগ্রন্থ) দিয়েছিলাম, ওতে ছিল পথ-নির্দেশ ও আলো। ইঞ্জীল-ওয়ালাদের উচিত, আল্লাহ ওতে (ইঞ্জীলে) যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে বিধান দেওয়া। *(সূরা মাইদাহ ৪৬-৪৭ আয়াত)*

সুতরাং এই দিক দিয়ে তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঈসা ﷺ যখন নবীরূপে প্রেরিত হলেন, তখন যারা ঈমান আনার তারা আনল এবং অবশিষ্ট ইয়াহুদ তাঁকে অস্বীকার ক'রে বসল। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ} (١٤) سورة الصف

অর্থাৎ, বানী ইস্রাঈলের একদল বিশ্বাস করল এবং একদল অবিশ্বাস করল। *(সূরা স্বাফ ১৪ আয়াত)*

আর খ্রিষ্টানরা মূসা ﷺ-কে নবী বলে অস্বীকার ক'রে বসল এবং তাওরাতকেও অবিশ্বাস করল। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ} (١١٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, ইয়াহুদীরা বলে, 'খ্রিষ্টানদের কোন (ধর্মীয়) ভিত্তি নেই' এবং খ্রিষ্টানরা বলে, 'ইয়াহুদীদের কোন (ধর্মীয়) ভিত্তি নেই'; অথচ তারা কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) পাঠ করে। *(সূরা বাক্বারাহ ১১৩ আয়াত)*

অতএব যখন খ্রিষ্টানরা তাওরাতকে অবিশ্বাস করল, অথচ তাতে ছিল তাদের শরীয়তের অনেক বিধি-বিধান, তখন তারা দ্বীনে অভিনব পথ (বিদআত) রচনা করল, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি এবং নিজেদের মূর্খতা ও ভ্রষ্টতাবশতঃ মনগড়া পদ্ধতি মতে ইবাদত করতে লাগল। বলা বাহুল্য, এদের নিকট ইল্মের কমি আছে। কিন্তু এরা আমলে বড় কর্মঠ ও সচেষ্ট।

এ ছাড়া তাদের ইবাদতের বৈশিষ্ট্য ছিল বিদআত। ত্রিত্ববাদ থেকে নিয়ে সন্ন্যাসবাদ ইত্যাদি সবই তাদের মনগড়া ছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

{ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا}

অর্থাৎ,অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারয়্যাম তনয় ঈসাকে, আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া; কিন্তু সন্ন্যাসবাদ এটা তো তারা নিজেরা প্রবর্তন করেছিল। *(সূরা হাদীদ ২৭ আয়াত)*

শায়খ ইবনে উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, ভ্রষ্ট খ্রিষ্টান বলতে উদ্দেশ্য হাওয়ারীদের পর থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবী হয়ে প্রেরিত হওয়ার পূর্ব যুগের খ্রিষ্টানরা। নচেৎ তার পরের যুগের খ্রিষ্টানরা তো ক্রোধভাজন জাতিতেই গণ্য। যেহেতু তখন তাদের বিরুদ্ধে দলীল পরিপূর্ণ এবং ইল্ম সমাগত হয়েছে। আর আল্লাহই অধিক জানেন। (আমপারার রেকর্ডকৃত তফসীর)

۞ ক্রোধভাজন ও পথভ্রষ্ট হওয়ার গুণ কি কেবল ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদেরই?

উক্ত গুণ দু'টি কেবল ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের জন্যই নির্দিষ্ট নয়। বরং যে কোন জাতির লোকই তাদের সদৃশ হবে, সেও উক্ত গুণের ভাগী হবে। মহান আল্লাহ কাফেরদেরকেও ক্রোধভাজন ও পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন---চাহে তাদের কুফরী মৌলিক হোক অথবা মুর্তাদ হওয়ার কারণে হোক। তিনি বলেছেন,

{مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

অর্থাৎ, কেউ বিশ্বাস করার পরে আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং অবিশ্বাসের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে অবিশ্বাসে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ তার চিত্ত বিশ্বাসে অবিচল। *(সূরা নাহল ১০৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلاَلاً بَعِيدًا}

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে ও আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে, তারা ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে। *(সূরা নিসা ১৬৭ আয়াত)*

বরং মুসলিমকেও আল্লাহর ক্রোধ ও গযবের ধমক দেওয়া হয়েছে, যদি সে তার কোন মুসলিম ভাইকে ইচ্ছাকৃত খুন করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (٩٣) سورة النساء

অর্থাৎ, যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট

হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত ক'রে রাখবেন। *(সূরা নিসা ৯৩ আয়াত)*

অনুরূপ লিআনকারী স্ত্রীকেও গযবের ধমক দেওয়া হয়েছে; যদি সে লিআনে মিথ্যা বলে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (٩) النـــور

অর্থাৎ, পঞ্চমবার বলে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহর ক্রোধ নেমে আসবে। *(সূরা নূর ৯ আয়াত)*

মোটকথা মু'মিন দুআয় চাইবে যে, আল্লাহ যেন তাকে ইয়াহুদ এবং তাদের অনুরূপ ফির্কা ও ধর্মের পথ থেকে দূরে রাখেন। যারা হক ও সত্য জানার পর তা মানতে চায়নি তথা নিজ ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করেনি। ফলে তারা দ্বীনকে হাল্কা মনে করে এবং তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ধর্মীয় বিধানের দূর ব্যাখ্যা করে, তার পরিবর্তন ঘটায়, কার্পণ্য ক'রে তা গোপন করে, তাদের হৃদয় কঠোর হয়ে যায়, লোককে ভাল কাজের উপদেশ দেয়, কিন্তু নিজেদেরকে ভুলে বসে।

মুসলিম এ দুআও করে যে, আল্লাহ যেন তাকে খ্রিষ্টান এবং তাদের অনুরূপ ফির্কা ও ধর্মের পথ থেকে দূরে রাখেন, যারা আমল তো করেছে; কিন্তু বিনা ইল্‌মে। ফলে তারা দ্বীনে বহু বিদআত রচনা করেছে। এমন বিধান রচনা করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। তারা শরীয়তের বিধানকে ভুল বুঝেছে। আম্বিয়া, আওলিয়া ও নেক লোকদের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করেছে ইত্যাদি। তারা জ্ঞানীদের কথায় কর্ণপাত করেনি। অথচ আল্লাহ বলেছেন,

{فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (٤٣) سورة النحل

অর্থাৎ, তোমরা যদি না জান, তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর। *(সূরা নাহল ৪৩, আম্বিয়া ৭ আয়াত)*

সুফ্‌য়ান বিন উয়াইনাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, (সলফগণ) বলতেন,

'আলেমদের মধ্যে যে খারাপ হয়েছে, তার মধ্যে ইয়াহুদের সাদৃশ্য রয়েছে এবং আবেদদের মধ্যে যে খারাপ হয়েছে, তার মধ্যে খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য রয়েছে।' সলফগণ (আরো) বলতেন, 'পাপাচার আলেম ও জাহেল আবেদের ফিতনা থেকে সাবধান থেকো, কারণ তাদের ফিতনায় সকল অনুসারী ফিতনায় পতিত হবে।' *(আল-ফাতাওয়াল কুবরা ২/১৪২)*

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, 'ইহদিনা' (পথ দেখাও) প্রার্থনা থেকে উদ্দিষ্ট হল,

এক ঃ উপকারী ইল্‌ম, তা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা, তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া।

দুই ঃ উপকারী ইল্‌মভিত্তিক নেক আমল।

এই দুই নীতির উপর সকল আম্বিয়া, সিদ্দীক্ব, শহীদ ও স্বালেহগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁদের নিকট উপকারী ইল্‌ম ছিল, আর তার সাথে ছিল সেই অনুযায়ী নেক আমল।

ইয়াহুদীরা উক্ত দুই নীতির একটি থেকে দূরে সরে যায় এবং ইল্‌ম অনুযায়ী আমল ত্যাগ ক'রে। আর খ্রিষ্টানরাও উক্ত দুই নীতির একটা থেকে দূরে সরে যায় এবং বিনা ইল্‌মে আমল করে।

পক্ষান্তরে নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ উভয় নীতি মেনে চলেন, ফলে তাঁরা সন্তোষভাজন হন, ক্রোধভাজন নয়। হিদায়াতপ্রাপ্ত ও পথপ্রাপ্ত হন, পথভ্রষ্ট নয়।

এ মুনাজাত মুসলিমকে সর্ব কালে ও স্থানে উপকারী ইল্‌ম অনুসন্ধান ও সেই অনুযায়ী বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিকভাবে নেক আমল করার ব্যাপারে প্রয়াস চালাতে ও সর্বতোভাবে হিম্মত ব্যয় করতে আহবান জানায়। তার কর্তব্য হল, সে ইল্‌ম সন্ধানের সকল পথ অবলম্বন করবে, নিজের হৃদয় থেকে মূর্খতার অন্ধকার দূর করতে আগ্রহী হবে, তার মাধ্যমে মহান

আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ করবে, তাঁর শরীয়তের বিধিবদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথাসাধ্য তাঁর ইবাদত করবে, উক্ত দুআ পুনঃ পুনঃ করার সাথে তার উক্ত জরুরী প্রয়োজনের কথা মনের ভিতর জাগরূক রাখবে।

পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য বহু বহু ইল্‌ম সঞ্চিত করা নয়, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিকভাবে আমল না ক'রে কেবল সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা করা নয়। উদ্দেশ্য হল, যে তওহীদ শিখবে, সে তা নিজে তার উপর আমল করবে। সে পরীক্ষা ক'রে দেখবে, মহান প্রতিপালকের যে সকল গুণাবলী সে জেনেছে, সেই অনুযায়ী কি সে তাঁর তা'যীম করতে পেরেছে? তদনুরূপ দেখবে যে, সে শরীয়তের যে আহকাম শিক্ষা করেছে, তার দ্বারা কি নিজের হিসাব নিতে সক্ষম হয়েছে, তা কাজে পরিণত করতে পেরেছে, নাকি বর্জন ক'রে চলেছে?

ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের অনুরূপ মুসলিমদের কতিপয় আমল

কত এমন মুসলমান আছে, যারা নামায ত্যাগের বিধান জানা সত্ত্বেও নামায ত্যাগ করে, আল্লাহর বাণী পরিবর্তনের শাস্তি জেনেও তার পরিবর্তন ঘটায়, আল্লাহর দ্বীন গোপন করে, হারাম জানা সত্ত্বেও দ্বীনের ব্যাপারে ছল-বাহানা করে, আত্মীয়তার বন্ধন ছেদন করা হারাম জানা সত্ত্বেও তা ছেদন করে, মিথ্যা হারাম জানা সত্যেও হলাহল মিথ্যা বলে, সূদ হারাম জেনেও সূদী কারবার করে, সেই কারবার লেখালিখি করে, সাক্ষ্য দেয়, গীবত হারাম জেনেও লোকের গীবত করে, ধোঁকাবাজি হারাম জেনেও ধোঁকাবাজিতে বাজিমাত করে, গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা হারাম জেনেও অনুরূপ কাপড় পরে, এই শ্রেণীর যত কাজ করা বা বর্জন করা হারাম জানা সত্ত্বেও যে করে বা বর্জন করে, সে আল্লাহর গযব ও ক্রোধের উপযুক্ত। সে ব্যক্তির পাপ অনুযায়ী শাস্তি হবে এবং তার মধ্যে

ইয়াহুদীদের সেই পরিমাণ সাদৃশ্য থাকবে, যে পরিমাণ সে জ্ঞানপাপী হবে অথবা জ্ঞান সত্ত্বেও---শরয়ী ওজুহাত বিনা---কর্ম বর্জন করবে।

কত এমন মুসলমান রয়েছে যারা বিধান না জেনে কবরের তওয়াফ (মাযারপূজা) করে, জন্মদিন পালন বিদআত না জেনে দ্বীন মনে ক'রে সকল প্রকার মীলাদ অনুষ্ঠান পালন করে, নেকী ও সওয়াবের আশায় কত নতুন নতুন ইবাদত (বা তার পদ্ধতি, পরিমাণ, স্থান, কাল বা গুণ) উদ্ভাবন করে, নবী ও ওলীর তা'যীমে বাড়াবাড়ি করে এবং তাঁদেরকে আল্লাহর দাসত্ব থেকে উর্ধ্বে উত্তোলন করে, অনুরূপ এমন অনেক আমল রয়েছে, যার বিধান না জেনে 'ভাল' মনে ক'রে করে, যে আমল আল্লাহ বিধিবদ্ধ করেননি, সেই আমল দ্বারা তাঁর নৈকট্য অনুসন্ধান করে। এমন লোকেরা 'ভ্রষ্ট' নামের ও তার শাস্তির চরম উপযুক্ত। আর তাদের মধ্যে তাদের কর্মের পরিমাণ অনুযায়ী খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য আছে।

এ একটি মহান দুআ, যার শব্দে আমাদের মসজিদ ও মুসাল্লাসমূহ মুখরিত ও গুঞ্জরিত হয় এবং আমাদের জিহ্বা সোচ্চার হয়ে ওঠে, কিন্তু আমরা তার অনেক অর্থ বুঝি না। ফলে প্রার্থনার সময় আমরা আমাদের মনে তা উপস্থিত করি না। আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যেক নামাযে দুআ ক'রে বলি, 'হে প্রতিপালক! আমাদেরকে উপকারী ইল্‌ম সন্ধানের তওফীক দাও।' কিন্তু হয়তো বা আমরা কুরআন শুনতে আগ্রহী হই না, আল্লাহর বাণীর অর্থ জানতে সচেষ্ট হই না, নববী হাদীস জানতে-শুনতে ও তার অর্থ বুঝতে আমরা আগ্রহী হই না। কুরআন-হাদীসের আলোচনা শুনতে আমরা আগ্রহ দেখাই না, নিজের দেহাত্মা ও বিশ্ব ও দিকচক্রবাল নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে উৎসাহী হই না। অথবা আমরা কোন না কোন প্রকার ত্রুটি ও শৈথিল্যের শিকার আছি।

আমরা দুআয় বলি, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আমাদের ইল্‌ম অনুযায়ী আমলের তওফীক দাও।' কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা

আমলের পথে চলতে চাই না। বরং আমাদের অনেকের ইল্ম বর্ধমান হয়, কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল স্বল্প পরিমাণ থাকে।

মুসলিমের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় জিনিস হল 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম'-এর প্রতি হিদায়াতের দুআ। আর বান্দার প্রতি আল্লাহর একান্ত মেহেরবানী যে, তিনি সে দুআ প্রত্যেক নামাযের (প্রত্যেক রাকআতে) ওয়াজেব করেছেন। বরং সে দুআকে তিনি বাচনিক রুক্ন হিসাবে মান দান করেছেন, যা দৈনিক তিনটি নামাযে সশব্দে পাঠ করতে হবে। সমস্ত নামাযীরাই তা সকল ফরয ও নফল সির্রী নামাযের প্রত্যেক রাকআতে পাঠ ক'রে থাকে।

কিন্তু দুআ করার সময় কয়জন নামাযীর স্মরণে থাকে যে, আল্লাহ তাকে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের পথ থেকে দূরে রাখুন। পরন্তু সে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, তাদের অন্ধানুকরণ করে, তাদেরকে বড় মনে ক'রে সম্মান প্রদর্শন করে, তাদের আকারে-লেবাসে, চরিত্রে ও জীবন-প্রকৃতিতে তাদের মত হওয়ার আশা পোষণ করে!

অর্ধেক ফাতিহায় সম্প্রীতি ও সম্পর্কছিন্নতার ঘোষণা

এই দুআর প্রতি লক্ষ্য করুন, যা অর্ধেক সূরা ফাতিহাহ জুড়ে সন্নিবিষ্ট রয়েছে। কিভাবে সকল প্রকার মু'মিনদের প্রতি সৌহার্দ্য, ভালবাসা, সম্প্রীতি ও অন্তরঙ্গতা রাখতে নির্দেশ দেয় এবং সকল প্রকার কাফেরদের প্রতি আশঙ্কা, বিতৃষ্ণা ও সম্পর্কছিন্নতার আহবান জানায়। পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত কাফের হল আসমানী কিতাবধারী ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান জাতি। তাহলে তাদের থেকে আরো নিকৃষ্ট কাফের যারা, তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হতে পারে?

এই দুআ নিয়ামতপ্রাপ্তদের সাথে অন্তরঙ্গতা রাখার কথা তাকীদ ও

শক্তিশালী করে। তাঁদের প্রতি ভালাবাসা বৃদ্ধি করে। তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে ও (আকারে-চরিত্রে) তাঁদের সাদৃশ্য অবলম্বন করার প্রতি আহবান জানায়। আর ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান ও তাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারীদের সাথে সম্পর্কছিন্নতা ও বিতৃষ্ণার কথা তাকীদ ও শক্তিশালী করে। এতে রয়েছে তাদের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ, যার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় সম্পর্কহীনতা। এতে রয়েছে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখার কথা, তাদেরকে 'কাফের' জানার কথা, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার কথা এবং তাদের আনুরূপ্য গ্রহণ না করার কথা।

বলা বাহুল্য, এ দুআ হল সম্প্রীতি ও সম্পর্কছিন্নতার আকীদা বদ্ধমূলকারী। বরং অর্ধেক সূরা ফাতিহায় রয়েছে উক্ত আকীদা সংক্রান্ত তাকীদ ও মৌলনীতি।

ফাতিহার দুআয় 'আমীন' বলা

নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠের পর ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী নামাযীর জন্য 'আমীন' বলা বিধেয়। 'আমীন' অর্থ হল, 'হে আল্লাহ! আমাদের দুআ কবুল কর।'

দুঃখের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে কত মুসলমান এমন দুআ করে (ও তার উপরে আমীন বলে), যারা তার অর্থই বোঝে না। আর আমাদের মধ্যে কত এমন লোক রয়েছে, যার কর্ম তার দুআ ও দাবীর প্রতিকূলে!

ইমামের সাথে আমীন বলার ফযীলত এসেছে হাদীসে। নবী ﷺ বলেছেন, "ইমাম যখন 'আমীন' বলবে, তখন তোমরাও 'আমীন' বল। কারণ, যার 'আমীন' বলা ফিরিশ্তাবর্গের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয়-- (অন্য এক বর্ণনায়) তোমাদের কেউ যখন নামাযে 'আমীন' বলে এবং ফিরিশ্তাবর্গ আকাশে 'আমীন' বলেন, আর পরস্পরের 'আমীন' বলা একই সাথে হয়---তখন তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ ক'রে দেওয়া

হয়।” *(বুখারী ৭৮২, মুসলিম ৯১৫নং)*

সুতরাং চেষ্টা রাখুন ভাইজান! চার ও তিন রাকআতবিশিষ্ট নামাযের প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআত পাওয়ার থেকেও বেশী চেষ্টা রাখুন ‘আমীন’ পাওয়ার। যাতে আপনি উক্ত ফযীলত লাভ করতে পারেন।

পরিশিষ্ট

পূর্বে যা উল্লিখিত হল, তা এই মহান সূরা ও তাতে সন্নিবিষ্ট জরুরী দুআর কতিপয় উজ্জ্বল দিক। এখন বুযুর্গ দুই ইমামের কিছু উক্তি উল্লেখ ক’রে আমি আমার এই আলোচনার ইতি টানব; যেমন উক্ত ইমামদ্বয়ের উক্তি দ্বারা আলোচনা শুরু করেছিলাম।

কোন কোন উলামা বলেন, ‘....বান্দার হিদায়াত প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা তার সুখ, পরিত্রাণ ও সাফল্যের জন্য একান্ত জরুরী। পক্ষান্তরে রুযী ও বিজয় প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা ততটা জরুরী নয়। যেহেতু আল্লাহ তাকে রুযী দেন। রুযী বন্ধ হয়ে গেলে সে মারা যাবে। আর মরণ থেকে তো রেহাই নেই। সুতরাং মরণের সময় যদি সে হিদায়াতপ্রাপ্ত থাকে, তাহলে মরণের আগে ও পরে সে সুখী। আর মরণ হবে চিরসুখ পর্যন্ত পৌঁছনোর সেতুবন্ধ। অনুরূপ বিজয়; যদি ধরে নেওয়া যায় যে, সে পরাজিত হয়ে খুন হয়ে গেল, তাহলে সে শহীদ হয়ে মারা যাবে এবং হত্যা হবে নিয়ামতের পরিপূর্ণতা। অতএব স্পষ্ট হল যে, রুযী ও বিজয়ের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা হিদায়াতের প্রয়োজনীয়তা বেশি বড়। বরং উভয়ের মাঝে কোন তুলনাই নেই।’ *(মাজমূউ ফাতাওয়া ১৪/৩৯)*

তাঁরা আরো বলেন, ‘বান্দা নিজ প্রতিপালকের কাছে যে সকল দুআ করে, তার মধ্যে এটি হল সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ। বান্দা নিজ প্রতিপালকের কাছে যে সকল দুআ করে, তার মধ্যে এটি হল সবচেয়ে বেশি ওয়াজেব দুআ। বান্দা নিজ প্রতিপালকের কাছে যে সকল দুআ করে, তার মধ্যে এটি হল

সবচেয়ে বড় উপকারী দুআ। যেহেতু তাতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল একত্রিত হয়েছে। বান্দা সর্বদা তার মুখাপেক্ষী। আর তার কোন বিকল্প নেই। সুতরাং যদি কেউ এক তৃতীয়াংশ নয়---বরং দশ ভাগের নয় ভাগ কুরআনের সওয়াব লাভ করে এবং এই দুআর বাঞ্ছিত জিনিস লাভ না হয়, তাহলে সে সওয়াব এ বাঞ্ছিত জিনিসের বিকল্প হতে পারে না এবং তার অভাব পূরণ করতে পারে না।’ *(ঐ ১৭/১৩২)*

কোন কোন উলামা বলেন, ‘যে ব্যক্তি সৃষ্টির অবস্থাসমূহ জানবে, সে ব্যক্তি এই দুআর প্রয়োজনীয়তা ও মুখাপেক্ষিতা অনুধাবন করবে। যে দুআ অপেক্ষা অধিক উপকারী ও অধিক জরুরী দুআ বান্দার জন্য নেই। এই দুআর প্রয়োজনীয়তা তার জীবন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা বেশী। যেহেতু শেষোক্ত দু’টি না থাকলে বড় জোর তার মৃত্যু হবে। কিন্তু এ (দুআর প্রার্থিত জিনিস) অর্জন না হলে চিরস্থায়ী দুঃখ ও দুর্ভাগ্য তাকে ঘিরে ধরবে।’ *(বাদাইউত তাফসীর ১/২৪৭)*

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা যে, তিনি যেন আমাকে, আপনাকে ও সকল মুসলমানকে হিদায়াতকারী হিদায়াতপ্রাপ্ত, সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন বানান এবং পথভ্রষ্ট ও ভ্রষ্টকারী না বানান। তিনি যেন আমাদের দুআ কবুল করেন এবং তাঁর সাক্ষাৎ পর্যন্ত আমাদেরকে (হিদায়াতের পথে) অবিচলিত রাখেন। (আমীন)

আর আল্লাহই অধিক জানেন।

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

সমাপ্ত